ভালবাসি? না। বরং দুই প্রকারের প্রকৃতি সহজে মিলিত হয়, একই প্রকারের হইলে বিবাদ হয়। দুই প্রকারের তাড়িত আকর্ষণ করে, এক তাড়িত প্রাপ্ত হইলে বিতাড়িত করে, বিজ্ঞানের এই শিক্ষা। নারী প্রকৃতি যত কোমল হয়, বীরপুরুষ তাহাকে তত ভালবাসে, কিন্তু কঠোর প্রকৃতি রমণী কঠোর-প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে চির বিবাদ। সুতরাং আমি ভাবি বটে যে, আমার মত সকলে হউক, কিন্তু আমার মত একজনকেও আমি সহ্য করিতে পারি না।

তবে কি হইলে মিলন হইবে? একরূপ হইলে হইবে না। আবার অন্যরূপ হইলে তুমি বলিবে, এ ব্যক্তি ঠিক আমার বিপরীত। আমি যদি তোমাকে না বুঝি, তুমি দুঃখিত হইবে। আর আমি ভালরূপ বুঝিয়া যদি তোমার সমালোচনা করি, তুমি মর্ম্মান্তিক চটিবে। তবে কোন্ পথে গেলে তুমি খুসী? তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় আমার নাই। কাহারও নাই।

তুমি যদি আমা হইতে উচ্চ হও, আমি ঈর্ষা করিব, যদি সমান হই, তুমি প্রতিযোগিতা করিবে, আর যদি ছোট হও, তবে তুমি ঘৃণিত হইবে। তবে কোথায় দাঁড়াই? অবস্থা, শিক্ষা কি পদের গুণে পরস্পরের মিলন হয় না।

ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখা যাউক, অনেকে মনে করেন, একধর্ম্ম হইলে মিলন হয়। সিয়া সুন্নি মুসলমানের বিবাদে কত নরহত্যা হইয়া থাকে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের বিবাদে কত দলাদলি হইতেছে। রোমান-কাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট কত জনকে জীবন্তে দাহন করিয়াছে, কতজনকে পশুর দংষ্ট্রে নিক্ষেপ করিয়াছে। নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই শাখাকে যদি দুই ধর্ম্ম বল, একের মধ্যেই তবে দেখ, অমুক কুলীন, ফুলে মেলের যাবনিক দোষ, বিষ্ণু দাসের উত্থান পতন, অমুক স্থানত্যাগী, এইরূপ যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ লইবে, তাহাতেও দোষের অন্ত নাই।

মিলন কোথায়? দেখিলাম, এক আকৃতিতে নহে, এক প্রকৃতিতে নহে, এক ব্যবসায়ে নহে, এক বংশে নহে, এক ধর্ম্মে নহে। পৃথিবীর কোন্ জিনিসের কোন্ অবস্থায় কত মিশ্রণে যে মিলন, তাহা কেহই বলিতে পারে না সুতরাং আমরা নিরাশ হই, বুঝি এ পৃথিবী, মিলনের ভূমি নহে।

এক কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিবার সময় মিলন হয়, কিন্তু একটু আগে কি একটু পরে গেলে হয় না। কুরু-সেনাপতি কুরুপাটকিনু নৃত্য দর্শনের জন্য নিম্নস্থ প্রধান সেনাপতিকে গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য পবিত্যাগের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বশিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একই পাণ্ডবপক্ষের দুই যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকী পরস্পর খড়্গ হস্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। কর্ণ বলিলেন, ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি যুদ্ধ করিব না, কুরুপক্ষে ভীষ্ম ও কর্ণ একত্র যুদ্ধ করিলেন না। ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বাহির হইয়া অন্য সমাজ করিলেন। আবার পণ্ডিত শিবনাথ—"এ মোর প্রাণের ব্যথা, এ মোর মর্ম্মের কথা, কারে বলি কে শুনিবে হায়।"—বলিয়া ডাক ছাড়িয়া বাহির হইলেন। তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

দেখিলাম, একক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পর্য্যন্ত মিলন হইল না, দল গেল না। সন্ন্যাসীগণ আপনাদের হইতে শ্রেষ্ঠ কোন লোক দেখিলে বিষ প্রয়োগ করে। দয়ানন্দ ও

বিশ্বয়কৃষ্ণ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বরং ধর্ম্মের গোল ভাঙ্গা আরও কঠিন, অন্ধ বাধা সহজে ভাঙ্গে।

কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে আমার কি দেখি, অপার বৈচিত্র্য মধ্যে অপার সম্মিলন, অনন্ত প্রেম। আমরা দেখি—

কোমল কমল কলি, আজি যে পড়িবে ঢলি
তপন কিরণে;
তপনের পানে চেয়ে, হাসিয়ে বিকল হয়ে,
বান্ধয়ে বন্ধনে।

প্রশান্ত গম্ভীর নীর সীমাহীন জলধির
থাকে অচঞ্চল,
সমীর সখার সনে মিশিলে আনন্দ মনে
করে কলকল।
পাহাড় লহরী তুলি হৃদয় ভাণ্ডার খুলি
করে সম্ভাষণ।

পরস্পর বিরোধী হইলেও প্রকৃতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। আম্র পল্লব পরস্পর-সম্মিলিত, দীর্ঘ পূর্ণ মসৃণ পত্র, অগ্রভাগে ঝুপি হইয়া থাকে। মুকুল ক্ষুদ্র ফুলরাজির সমষ্টি, ফলের ভিতরে বীজ, বাহিরে মিষ্ট ও কঠোর আবরণে আবৃত। পলাস পত্র পর্য্যায়ে অবস্থিত, ঈষৎ দৈর্ঘ্যযুক্ত গোলাকার মসৃণ পূর্ণ পত্র। দুগ্ধস্রাবী পুষ্পরাজি একত্রিত হইয়া প্রকাণ্ড কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘায়ত ফল উৎপাদন করে। এবং ফলাদি এক বোটায় সংযুক্ত হইয়া অভ্যন্তরেই বিকশিত হয়। মিষ্ট আবরণে বেষ্টিত খাদ্যোপযোগী বীজ ভিতরে পাতালা গাত্রাবরণে আবৃত। কিন্তু এই দীর্ঘ বৃক্ষদ্বয় পরস্পর এক বাগানে সম্মিলিত। কেহ কাহারও বিরোধী নয়। আবার হীনবংশ মাধবী লতা স্বচ্ছন্দ-সহকারে উঠিতেছে।

বিটপীর উচ্চ শিরে বাহিয়া উঠিছে ধীরে
লতা হীন জন।

পক্ষীগণ কত ভিন্ন পর্য্যায় শ্রেণীতে ও বিচিত্র রঙ্গে অবস্থিত, অথচ

এ ঝোপে ডাকিছে পাখী সোণায় বরণ মাখি
সুতানে সুস্বরে।
অন্য কুঞ্জে তদুত্তরে সঙ্গীত-লহরী ঝরে
তুষিয়া অন্তরে।

প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন কুঞ্জবনে অহিংস্রক হরিণ, গরু, ছাগ, মেষ বিরাজ করে, আবার কিঞ্চিৎ দূরেই নখ দন্ত-সমন্বিত হিংস্র শ্বাপদকুল, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল বিরাজ করে, কোন উচ্চ ধ্বনি-সমুত্থিত বিশাল গর্জ্জন প্রকৃতি মধ্যে শুনি না। বরং তান লয় বিশুদ্ধ ভাবে সকল চলিতেছে, কেহ কাহাকেও না ভক্ষণ করে, এমন নহে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নহে, এমনও নহে; অথচ প্রকৃতির গভীর শান্তি বিচলিত হয় না।

এত বিরোধী ধর্ম্ম, এত সংঘর্ষণ, এত বৈচিত্র্য, তথাপি তন্মধ্যে এক অনন্ত প্রেম বিরাজ করে।

যখন বিশ্বরাজ্যে এই আপাতঃ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে এমন পবিত্র প্রেম বিরাজ করে, তখন মানব পরিবার, যাহাকে তোমরা সৃষ্টির প্রধান বলিয়া থাক, তাহার মধ্যে কি সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই? তাহারাই কেবল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দলাদলিতে বিভক্ত হইয়া বিবাদ বিসম্বাদে জগৎকে বিব্রত করিবে?

সুতরাং আমরা বুঝিলাম, এ কার্য্য ধর্ম্ম দ্বারা হয় না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ আছে, জগতে কতকালে একধর্ম্ম আসিবে, কে জানে? এক-বর্ণ, এক আকৃতি আসিবে না। প্রকৃতি মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিবেই। আর বড় যিনি, তাঁহার ন্যায় যদি ছোট উঠিতে চান, অমনি বলিবে,

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন? পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম এ প্রতিযোগিতা নর-সংসারে থাকিবেই, একজন অন্যজনকে অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে চলিতে চাহিবেই চাহিবে। কিন্তু যতক্ষণ ও যেজন্য প্রতিযোগিতা, তাহা ভিন্ন বিরোধ বাধিও না। প্রতিযোগিতা জীবন-সংগ্রামের জন্য, জীবনের অভাব দূর হইলে তাহার কঠোরতা দূর কর। যখন সকলের এক মত, এক শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, তখন তাহা চাহিও না। মস্তিষ্ক মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে, তাহার শ্বেত ও ধূম্র সামগ্রীর অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি নিহিত আছে, এবং শরীরের যে শক্তি তাহার উপর ক্রিয়া করিয়া মিল স্পেন্সার হইতে নির্ব্বোধ জড়ভরৎ পর্য্যন্ত, খ্রীষ্ট ও কেশব হইতে জুডাস পর্য্যন্ত, নানা বৈচিত্র্যময় মানব-পরিবার গঠন করিয়াছে, তন্মধ্যে একতার আশা করা অসম্ভব, তাহা কখনও হইবে না, এবং হইলেও সংসার চলিবে না। হীন, দীন, বৃহৎ, শক্তিবান, দুর্ব্বল, মূর্খ থাকিবেই থাকিবে। তবে যদি বল, সব একরূপ না হইলে ভালবাসিব না। তবে তোমার আশা কখনও পূর্ণ হইবে না।

দেখিলাম, বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, একতা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, মানব-পরিবারের শুভ-সম্মিলন আমাদের বাসনা, ধর্ম্ম-সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা। কেবল ধর্ম্মসমন্বয় কেন? সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিশ্বের সমগ্র বিভাগে, সমস্ত মানব পরিবার মধ্যে এক গভীর প্রেম, গভীর সমন্বয় কিসে আসিবে?

তুমি আমা অপেক্ষা শিক্ষা অধিক পাইয়াছ, তুমি ভাবিতেছ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, রাম লিখিতে পড়িতে শিখে নাই, তাহার সিদ্ধান্ত তুমি সমীচীন মনে কর না। কিন্তু সহজেই মনে করিতে পার যে, আমারও ভুল হইতে পারে, অথবা উভয়েরই আংশিক ভুল। পূর্ণ জ্ঞান মানবের কখনই হয় না। এক-শ্রেণীর দার্শনিকেরা মনে করেন, জগতের সকলই ভ্রান্তি, আর এক শ্রেণী মনে করেন, অনেক বিষয়ে আমার জ্ঞান পরাঙ্মুখ। সুতরাং যদি অনেক বিষয়ই আমরা না জানিতে পারি, তবে এক ভ্রাতা যদি আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম জানে, তবে সেজন্য তুমি রাগ কর কেন? উপরে দেখিতে গেলে আমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত আছেন, আবার নীচে দেখিতে গেলে মূর্খেরও অভাব নাই, ধনী অপেক্ষাও ধনী, রাজরাজেশ্বর আছেন। শক্তিশালী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শক্তি আছে। ছোট ও বৃহৎ, কিছুরই অভাব নাই। অতএব আগে মনে কর, আমি কত বিষয় জানি না, সুতরাং না জানে যে, তাহাকে ক্ষমা কর, শিখাইয়া লও, চালাইয়া লও, রাগ করিও না। আর যদি একজনে ভুল করে, কি দোষ করে, ভাবিয়া দেখ আমার কত ভুল ও কত দোষ আছে, সুতরাং দোষ বুঝাইয়া দেও ও ক্ষমা কর। আমি কি ক্ষমার যোগ্য নহি? ভাবিয়া দেখদেখি, আমার হৃদয়ে কত দোষ দুর্ব্বলতা আছে, যদি ভগবান আমায় ক্ষমা না করিতেন, তবে আমার কি দুর্দ্দশা হইত। তুমি যেমন ভগবানের দরবার-প্রার্থী, সেইরূপ অন্য লোককে তোমার কৃপাপাত্র, মনে করিয়া ক্ষমা কর ও তাহাকে শিক্ষা দান কর। অবোধকে শিক্ষা দিবার জন্য জগতে কত প্রণালী হইয়াছে। একদল সিংহ ব্যাঘ্রের কবলে ফেলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, কোন দল অগ্নি ও তরবারী হস্তে করিয়া নরহত্যা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি পরিচালন করিয়া মনে করিয়াছেন, উত্তম শিক্ষা দিলাম। কিন্তু সকলেই একরূপ নহে। আবার এক মূর্খ এক সদাশয় ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিল, সদাশয় মহাত্মা

তাহার উচ্চ শিক্ষা দিয়া হৃদয়ে চির-অনুতাপানল প্রজ্বলিত করিলেন। কেহ আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা অজ্ঞান লোকের মূর্খতা দূর করিলেন। অশেষ্য দুর্ব্বৃত্তদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আবার মহাত্মাগণ নিজের শাস্তিদাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, ক্ষম পিতা, তাহারা জানে না, কি করে।

এই উদারতার সহিত প্রেম চাই। উদারতা ক্ষমা করে, প্রেম চায় কোলে নিতে। আহা, আমার ভ্রাতাগণ অজ্ঞানতাকূপে পড়িয়া রহিল, এদের কি হবে, কেমন করিয়া এদের সংশোধন করি? ইহা কার্য্যের প্রসূতি। অমনি তোমার মনে শত উপায় আসিল, দয়াময় তোমার প্রার্থনা শুনিলেন। তুমি বিদ্যালয় করিলে, ড্যাভিড্ হেয়ারের ন্যায় শত শত লোককে শিক্ষা দিলে, তাহারা তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিল। মহম্মদ মহীসিন সৎকার্য্য, বিশেষত শিক্ষাদানের জন্য প্রচুর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। আজি শত শত শিক্ষার্থী দরিদ্র সমস্বরে বলিতেছে, জয় মহম্মদ মহীসিনের জয়। বিদ্যাসাগর নারীগণের জন্য প্রাণ মন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা ক্লেশ দূর ও অব্যবহারের জন্য অশ্রু ফেলিলেন। আজি সকলে বলিতেছে, ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই প্রেমের নিকট পাষাণ পরাজিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ যখন শ্রীচৈতন্য ও সাঙ্গোপাঙ্গের নিকট জগাই মাধাইয়ের দেহ ভিক্ষা করিলেন, তাহাদিগকে বলিলেন, "মেরেছিস কল্সীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিবনা," তখন পাষণ্ডগণ কাঁন্দিয়া আকুল হইল। শত প্রহারে, কি মোকর্দ্দমায় তাহা হইত না। সুতরাং প্রেম জগজ্জয়ী। প্রেমই ছোট বড়কে এক দৃঢ় অথচ সুখস্পর্শ কোমল বন্ধুতে বাঁধিয়া ফেলে। প্রেমে মহা শক্তি, প্রেমই ঈশ্বর।

আমার অদ্যকার বিষয় দল। আমাদের একটী সংস্কার আছে, যে দল বান্ধিয়া উহাকে শাস্তি দিব। গবর্ণমেণ্ট শাস্তি দেন আইন দ্বারা, আমরা শাস্তি দেই সামাজিক শাসন দ্বারা। সামাজিক শাসন প্রার্থনীয়, ইহার নাম Public opinion আইনের ভয় যাহা না করিতে পারে, সাধারণের মত তাহা করিতে পারে। এই সমাজের ভয় অনেক লোককে ভীত করে। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু-জাতি এই সমাজের ভয়ে এত অস্থির যে, সমাজবন্ধনের ভয়ে নড়িতে চায় না। আমি কুসংস্কার মানি না, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম চাই, এই কথা বলিলে সমাজ তোমাকে চাঁপিয়া ধরিবে, আর যদি তুমি বল বর্ত্তমান প্রণালীতে আমি বিবাহ দিলাম, তোমার আর সাধ্য কি? অমনি তোমার গলায় পা দিবে। তুমি যদি বল, নারীজাতির ক্লেশ বিদূরিত করিব, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিব, বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিব, বহু বিবাহ দূর করিব, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিব, তোমার প্রাণে বাঁচান ভার হইবে। তুমি যদি বল, নিম্নশ্রেণীকে মানুষ বলিব, সাধারণ লোককে শিক্ষা দিব, সাম্যমন্ত্র প্রচার করিব, তোমার নড়িবার সাধ্য থাকিবে না, সামাজের বন্ধনে তোমার সর্ব্বাঙ্গ অচল হইবে। দল নামক প্রকাণ্ড রাক্ষস তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তাহা বক্ষ অনীকিনীর ন্যায় গজরাজ-তেজ-ভুজে, কালাগ্নি-সম্ভবা বিভার ন্যায় তোমাকে গ্রাস করিতে আসিবে, যদি ভয়ে পশ্চাৎপদ হও, তাহার গর্জ্জনে অধীর হইবে কাম্পিত হইবে, কিন্তু সিংহ বীর্য্যে বল, আমি তোমায় গ্রাহ্য করিনা। অমনি প্রভাত-

কুয়াসা সম বালার্ক কিরণে গলিয়া যাইবে।

এই ত শক্তি, অথচ ইহার জ্বালায় বিলাত-ফেরত সমাজ-চ্যুত হইল। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, সকলে সমাজচ্যুত। যাঁহারা দেশের গৌরব, পবিত্র পুণ্যবান, তাঁহারা নাকি অস্পৃশ্য, তাঁহাদের অন্ন স্পর্শে ঘোর অধঃপতন। হায় মূর্খতা, তোমার শক্তি অসীম।

সামাজিক শাসন সামাজিক পাপের ঔষধ, সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানযুক্ত শাসন, সে-ই মহৌষধ। ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তিগত ক্রোধ ইহার নেতা হইলে তাহার তামসিক শক্তি অতি ঘৃণিত। অধিকাংশ স্থলে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। এবং এইজন্যই যাহারা দল বান্ধে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি।

এই দলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত, সম্প্রদায়ের শক্তি অপহৃত, এবং প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হস্ত পদ বাঁধা। তুমি শূদ্র, তুমি ওঁতৎসৎ বলিও না, তোমার জিহ্বা খসিয়া পড়িবে। তুমি অন্যের স্পর্শ জল খাইও না, তোমার জাতি যাইবে। তুমি ছুঁইও না, আমার ব্রাহ্মণত্ব যাইবে। তুমি তোমার সর্ব্বদা অগ্নিদাহে জর্জ্জরিতা দুহিতার দুঃখ বিদূরিত করিতে পার না, তুমি তোমার পত্নীকে দিবালোকে বাহির করিতে পার না; তুমি তোমার প্রিয়তমা নারীগণকে শিক্ষা দিতে পার না, তুমি সমুদ্র পারে যাইতে পার না। তুমি অন্যের ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতে পার না।

এই দল আজিকার শত শত বাঙ্গালী সন্তানকে হিন্দুসমাজ হইতে অপসৃত করিয়াছে, কাহাকেও মুসলমান, কাহাকেও খ্রীষ্টান বলিয়া দূরে রাখিয়া দিয়াছে। আচারে বিচারে, স্বার্থে পরার্থে তাহারা ভিন্ন। অথচ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্যের ন্যায় খ্রীষ্টপন্থী, আল্লা-পন্থীকে দলে রাখিতে পারিত, হিন্দু-নামে অভিহিত করিতে পারিত। আমি জানি, অন্য ধর্ম্মের অত্যাচারে হিন্দু সন্তান যবনস্পৃষ্ট হইয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দু অনুষ্ঠান করিয়াও দলে উঠিতে পারিলনা। দিন দিন হিন্দুসমাজ ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইয়া, সূক্ষ্মতর ইথারের ন্যায় অন্তর্হিত হইতে চলিল, তথাপিও দলাদলি ঘুচিল না।

এই দলাদলি বাঙ্গালীর নিজস্ব, অথবা হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তি। বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দলাদলি, জাতীয় সমিতিতে দলাদলি, ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচারে বিচারে দলাদলি, এবং এই জন্য আমি মনে করি, বাঙ্গালী জাতি অধঃপতিত। মুসলমানের একতা চিরপ্রসিদ্ধ, বাঙ্গালীর দলাদলি তদপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ নহে। ফলাফল সকলেই জানেন, তাই বলি, ভাই, ক্ষুদ্র চক্ষে জগৎকে দেখিও না, বিশ্বপিতার অনন্ত প্রেমের দিকে চাহিয়া দেখ, তিনি কি বলিতেছেন, আর তুমি কি করিতেছ! অনন্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র কত দূরে থাকিয়াও এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, কিরণ দানেও পরিভ্রমণে সহায়তা করিতেছে। আর আমরা একগৃহে থাকিয়াও মিলিতে পারিলাম না। পরের দোষ দেখিও না, অগ্রে ভাবিয়া দেখ, আমরা কোন্ বিষয়ে মিলিতে পারি। আগে প্রভেদের দিকে চাহিওনা। প্রেম যেমন অনন্ত, বৈচিত্র্যও তেমনি অনন্ত, সুতরাং এই অনন্ত বৈচিত্র্য অনন্ত প্রেমের সহকারী। রামধনু সপ্ত বর্ণের সমবায়েই সুন্দর, পুষ্প সবুজ পত্রদল, লাল কি শাদা পল্লবদল সমবায়েই এত সুন্দর। পাখীর মধ্যে

ময়ূর সাতবঙ্গের সম্মিলনে এত সুন্দর। কোকিল সপ্তস্বরের জন্য এত মধুর হারমনিসম ত্রিবিধ স্বরযোগে এত মিষ্ট। তাই আসুন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, জ্ঞানী অজ্ঞান, বিদ্বান মূর্খ, বলবান দুর্ব্বল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ, নমশূদ্র ভুইমালি, এক জননীর পুত্র, একমাত্র জননীর সন্তান বলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। পদ্মার জল যখন পুকুরে আইসে, তখন যেমন তাহার ধাপদল কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি, এই সাহিত্যপরিষৎ সকল সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি, হিন্দু মুসলমান প্রভেদ দূর করিয়া এক ভাষা-ভাষীগণ আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে মিলিত হই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

কৃতঘ্নতা।

"ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতি র্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।"

৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন সাধক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, শেষ জীবনে রামানন্দ স্বামী নামগ্রহণ করিয়া হিন্দু-সাধন-মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে আমাদিগকে তিনি বিশেষ কৃপা করিতেন। বলিতেন, "সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" শেষ-জীবনেও তিনি কলিকাতা আসিলেই, সাধক বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনারায়ণ পরমহংসের ন্যায়, আনন্দ-আশ্রমে আসিতেন। তাঁহার অযাচিত স্নেহের ঋণ কিছুতেই পরিশোধ হইবার নয়। তিনি শেষ জীবনে একবার আনন্দ আশ্রমে আসিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন- "তোমার মিসানথ্রোপ (Misanthrope) হওয়ার কত বাকী?" আমি বলিয়াছিলাম, "এমন আশীর্ব্বাদ করিবেন না, আমি প্রতিদিন বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি, এইরূপ কলঙ্কে যেন কখনও আমাকে কলঙ্কিত হইতে না হয়।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন না একদিন তোমাকে মিসানথ্রোপ হইতেই হইবে—গত্যন্তর নাই।" নীরবে তাঁহার কথা শুনিলাম,আর তর্ক করিলাম না। এই নির্ম্মম উক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"যখন তুমি পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তখন উপকৃত ব্যক্তির নির্ম্মম ব্যবহার পাইয়া পাইয়া শেষে তোমাকে এই মহা শিক্ষা পাইতে হইবে—কাহারও উপকার করিলেই সে কালে তোমার অনিষ্ট করিবে। তাহা যদি না পারে, তোমার নিন্দা করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শ দেখিয়া শিক্ষা পাও নাই কি?"ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,--"আমি কোন প্রত্যাশা রাখিয়া কাহারও উপকার করি না, তবু মিসানথ্রোপ হইতে হইবে?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "তোমার গত্যন্তর নাই, কারণ তুমি দেহধারী।"

এই কথা যেবার বলিয়াছিলেন, তাহাই শেষ বার, তারপর আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কত দিন চলিয়া গিয়াছে, তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা কয়টী কাণে আজও বাজিতেছে। ঘটনা-চক্রে পড়িয়া শিখিয়া, শেষে কি মানব-ঘৃণাকেই অবলম্বন করিতে হইবে?

মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহোদয়কে কেহ নিন্দা করিয়াছে শুনিলে তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিতেন—"কই আমি ত তাহার কোন উপকার করি নাই, তবে সে নিন্দা করিল কেন?" মানব-ঘৃণা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবু তিনি কাহারও উপকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, কাহারও অভাবের কথা শুনিলেই তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত—যেরূপে পারেন, অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় কখনও কাহারও উপকার করিতেন না—সকল স্বার্থ ভুলিয়া পরের উপকার করিতেন। এরূপ আদর্শ-জীবন এদেশে আর হইবে কি? সাধক রামকুমারও স্বর্গে, দয়ার অবতার বিদ্যাসাগরও স্বর্গে। প্রতিদিনই উপকৃত ব্যক্তির নির্ম্মম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইতেছি, এবং তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতেছি। কাহারও উপকার করিলেই তাহার হস্তে নিন্দিত, নির্য্যাতিত, প্রহৃত, তিরস্কৃত হইতেই হইবে কি? আর ঐ রূপ হইয়াও, মানব-ঘৃণাকে বর্জ্জন করিয়া চলিয়া যাইতে পারা সম্ভব কি? কিছুদিন ঘটনা-প্রহৃত হইয়া কেবল এই কথাই ভাবিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

কৃতজ্ঞতার সজীব দৃষ্টান্ত যে জগতে নাই, একথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। মাতার অপরাজিত স্নেহ, পিতার অযাচিত দয়া, আত্মীয় বন্ধুবর্গের কৃপা—সদা প্রাণে জাগিতেছে। জাগিতেছে এবং কৃতজ্ঞতায় হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। প্রতিনিয়ত দয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্বেশ্বরের অমোঘ শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া প্রাণকে সরস করিতেছে। সে সকল দেখি এবং ডুবি, ডুবি এবং মজি, মজি এবং আত্মহারা হই। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কত অপরাধী, শত সন্তাপিত, এবং কত ভ্রান্বিত;—তাঁহার কি অপার দয়া যে তিনি জীবন্ত ভাবে সদা আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গন দিতেছেন।

কত মাতা, কত পিতা, কত ভাই ভগ্নী, কত বন্ধু বান্ধব, চতুর্দ্দিকে, দয়া করিয়া মজাইতেছেন যখন ভাবি, তখন আর অভিযোগ করিবার কি থাকে? অযাচিত ভাবে দিবারাত্রি তিনি প্রকট মূর্ত্তিতে কত করিতেছেন। আমাদের প্রতিদান কিছুই নাই,—তবুও অপ্রতিহত ভাবে দয়া বর্ষণ করিতেছেন,—ধরিতেছেন, রাখিতেছেন, বাঁচাইতেছেন, ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতেছেন। সে ঋণ যে পরিশোধ করিতে পারে নাই, তাহার কি অভিযোগ করিবার কিছু আছে? থাকা সম্ভব কি? তবে ঐ মহাত্মারা কেন মানব-ঘৃণার কথা প্রচার করিয়া গেলেন? কেন মানবের অপব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন।

জ্যোতির ধারে আঁধার, সুখের ধারে দুঃখ, মিষ্টত্বের ধারে তিক্ত, শান্তির ধারে অশান্তি, কেন এই জগতে দেখিতেছি? মাতৃ মূর্ত্তি জাগে, পিতৃ ছবি জাগে, বন্ধুদের ভালবাসা জাগে—তাহার ধারে বিষ, শত্রুতা, অত্যাচার, নিন্দা, নির্ম্মম ব্যবহার জাগে কেন? আমরা স্বপ্নেও কখনও যাহাদের কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, অনিষ্ট চিন্তা করা দূরে থাকুক, প্রাণ দিয়া যাহাদের উপকারের চেষ্টা করিয়াছি,—পারি বা না পারি, না খাইয়া, না পরিয়া যাহাদিগকে খাওয়াইয়াছি ও পরাইয়াছি, তাহারা কেন আজ বিমুখ? কেন শত্রুতা সাধনে রত? কেন, কেবল নিন্দা উদ্গমন করিতেছেন। বানর্জ্জি, চৌধুরী, সরকার, রায়, দাস প্রভৃতি কত পত্নী এবং কত পতি—কত কত জন কেন এত উপকার পাইয়াও আজ

শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর? পরশ্রীকাতরতা বাঁচিতেছে কেন? পরনিন্দা পরচর্চ্চা জাগিতেছে কেন? হিংসা বিদ্বেষ এ ধরা হইতে বিলুপ্ত হইল না কেন? কৃতঘ্নতা কেন প্রাণ হরণ করিতেছে? মানুষ কেন পশুত্বে নমিত হইতেছে? কেন দলাদলি, কাটাকাটি, মারামারি চতুর্দ্দিকে?

ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহা কেবল হিংসা বিদ্বেষের ছাউনি, কাটাকাটি মারামারির জীবন্ত চিত্র। গ্রহ উপগ্রহ খুঁজিয়াছি, সেখানে কেবল কক্ষচ্যুতি, উল্কাপাত, জ্যোতির্দ্দমন। ধর্ম্মেতিহাস পড়িয়াছি, সেখানে জুডাস ইস্কারীয়ট,—কত কুরুক্ষেত্র ও পালেসটাইন রক্তে রঞ্জিত। কত রক্তারক্তি, কত জীবন-নাশ, কত অত্যাচার, কত অবিচার। ফল্গু-বুক-অবমার্টাস্ উষ্ণ শোণিত-বিন্দুতে লেখা। মানুষের ভাগ্যে কেবল দুর্দ্দিন, কেবল অশান্তি। মানুষ মানুষ হইল কবে? কত শাস্ত্র, কত উপদেশ ব্যর্থ হইল—চতুর্দ্দিকে জাগিতেছে কেবল অমানুষের দল। সোণার প্রতিমাকে কালিমায় আবৃত করিল কেন? এডাম-ও-ইভের পূত দেহে কালিমা ঢালিল কে? রিপু সংগ্রামে, ইন্দ্রিয় তাড়নে, বৃত্তির অনুশাসনে মানুষ কেন এত কদাকার হইল?

সুরাসুরের সংগ্রাম আবাহমান চলিতেছে,—কুরু-পাণ্ডব ও রাম-রাবণের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। ঘরে ঘরে, রাজ্যে রাজ্যে, দেহে দেহে—কত সংগ্রাম চলিতেছে। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের ধারেই ক্রুটাস সকল জাগিতেছে—পুণ্যভূমি রসাতলে যাইতেছে। হা দুর্দ্দৈব, শান্তি কোথায়? আনন্দ কোথায়? বিশ্রাম ও বিরাম কোথায়? যতদিন জীবন, ততদিনই সংগ্রাম,—মন্দের দ্বারা ভালো নিষ্পেষিত, অসুরের দ্বারা দেবতা পিষ্ট। অনুসন্ধান কর—বুঝিবে, জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি এ জগতে কোন দিনও হয় নাই,—কখনও বুঝি বা হইবে না।

এত দুঃখ জ্বালা সহিবার জন্য তবে কেন জীবন ধারণ? তবে কেন সুখ-স্পৃহা? তবে কেন উল্লম্ফন এবং জাগরণ? বুঝি বা তাহা কেবল মৃত্যুর জন্য। পতঙ্গ উড়িয়া উড়িয়া আগুনে পড়িতেছে, দেহপাতের জন্য। বিধাতার বিধান, কে খণ্ডাইবে? তুমি আমি কোন্ ছার যে তর্ক তুলি, কথা বলি?

মনুষ্যকে তিনি কি মানুষ করিতে পারেন না? পারেন এবং পারিতেছেন। পৃথিবীর কষ্ট যন্ত্রণা কেবল প্রসূতির সন্তান-প্রসবের পূর্ব্ব-যন্ত্রণা। এই রূপে, এই পথেই চলিতে হইবে। পুষ্পশয্যা কণ্টক শয্যা, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, স্বাস্থ্য রোগ—এই সব পথ ধরিয়াই যাইতে যাইতে শেষে মহা শান্তিধামে পৌঁছিতে হইবে। মৃত্যু পর্য্যন্ত এই যন্ত্রণা অনিবার্য্য।

সুখে থাকিতে কাহার ইচ্ছা ছিল না? কে সুখে থাকিতে চেষ্টা করে নাই? ভাল হইবার জন্য আজীবন কত চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ভাল হইলাম কই? কথা মিষ্ট হয় না, লেখা মধুর হয় না, ইন্দ্রিয় দমিত হয় না, রিপু বিলুপ্ত হয় না,—আপন-পর-ভেদ-বোধ ঘুচে না,—কেবল কালিমা—কেবল গাঢ় কালিমায় দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছি। তোমার ব্যবহারে আমি বিরক্ত, আমার ব্যবহারে তুমি বিরক্ত। আমি তোমাকে গালাগালি দেই, তুমি আমাকে গালাগালি দেও। ইহারই নাম সংসার। সংসার, তোমাকে ও আমাকে কেবল নরকের পথেই যেন টানিতেছে। যদি মানুষ হইতাম, তবে কি একপ হইত? মহাসংগ্রামে জয়লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। বৃদ্ধের জীবন ধারণ বৃথা হইয়াছে—সংসার-নিরঞ্জন-

তটে ধর্ম্ম-সিদ্ধার্থের অভ্যুদয় হইল না॥ কাঁদিতে কাঁদিতেই আমাদের জীবনপাত হইতে চলিল। ইহাই কি বিধাতার বিধান?

চতুর্দ্দিকে কেবলই নিরাশের হা হুতাশ। তোমার ঘরেও ক্রন্দন, আমার ঘরেও ক্রন্দন। শোক-সন্তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা সর্ব্বত্র, সর্ব্বগৃহে, সর্ব্ব হৃদয়ে! এ রাজ্যে কেহই চিরসুখী নয়।

তবে কি মানব-ঘৃণাই সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিবে—সব ভালো ডুবিবে, কেবল মন্দটুক জাগিয়া উঠিবে? সাধুর কথা অব্যর্থ হইবে না কি? মানুষের তিক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমরাও কি তিক্ত ব্যবহার করিব? কিন্তু মহাত্মা বিদ্যাসাগর ত তাহা করেন নাই। তিনি প্রহার পাইয়াও কোল দিয়াছেন। খ্রীষ্ট তাহা করেন নাই, তিনি মৃত্যুর সময়ও ভ্রাতাদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ তাহা করেন নাই, তিনি আহত হইয়াও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। আদর্শ—প্রহারে প্রহার নয়—আদর্শ—প্রহারে আলিঙ্গন। আদর্শ—প্রত্যাশা রাখিয়া নয়, প্রত্যাশা ডুবাইয়া পরের উপকার কর। প্রত্যুপকারের আশা বণিক-বৃত্তি—তাহা ধর্ম্মের সোপান নয়। প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে যদি প্রতিপ্রহার বর্ষিত হয়, তবুও বিচলিত না হওয়াই আদর্শ। সে অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তুমি করিবে কেন? কিন্তু মানুষের পক্ষে সব সময়ে এহেন ধৈর্য্য সম্ভবে কি? সুতরাং প্রতিপ্রহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তাহার ফলে আরো অশান্তি ও অপ্রেম সংসারে জাগিয়া উঠে, এবং সংসার বাসের অযোগ্য হয়। কিন্তু বাসের অযোগ্য হইলেও, স্বেচ্ছায় কয়জন জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে? ইচ্ছা না থাকিলেও সহ্য করিতেই হইবে। সহিতে সহিতে মহা সহ্যের রাজ্যে পৌঁছিতে পারা যায়। সেখানে বিষ্ঠা-চন্দন সমান হইয়া যায়। সে অহেতুকী ভক্তির রাজ্য—অচ্যুত-ধাম।

মানবের লক্ষ্য কি? কেবল জীবন-বিসর্জ্জন। জীবন-বিসর্জ্জন কাহাকে বলে?—আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ কি বস্তু? আত্মত্যাগ বৈকুণ্ঠের সোপান। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, নিশ্চিন্ত, নিষ্কাম হইয়া কেবল পরসেবা করিলেই আত্মত্যাগের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। কামনা যেখানে, সেখানে বাণিজ্য আছে, ধর্ম্ম নাই; সংসার আছে, স্বর্গ নাই। কামনা বর্জ্জন ভিন্ন ধর্ম্ম ও স্বর্গে কাহারও অধিকার জন্মে না। গভীর সাধনা ভিন্ন কেহই তাহা আশা করিতে পারেন না।

পৃথিবীময় কৃতঘ্নতা, জুয়াচুরী, হিংসা, বিদ্বেষ, অপ্রেম, কু-বাসনা গজগজ করিতেছে। তাহা যদি ভুলিতে পার, অচ্যুতধামে যাইতে পারিবে। নচেৎ বণিক-বৃত্তি শিখিয়াছ, তাহা কর, কিন্তু জানিও, তাহাতে শান্তি নাই, সুখ নাই, আরাম নাই, ভক্তি নাই। দোষ স্মরণ করিতে হয় নিজের দোষ স্মরণ কর; এবং অন্যের মহত্ত্ব ও গুণ-চিন্তনে ব্যাপৃত হও। অনন্তরূপিণী মা সর্ব্বঘটে আবির্ভূতা—ভাই, চিন্ময়-মূর্ত্তি মৃণ্ময়ে দেখ—দেখিয়া আত্মহারা হইয়া হইয়া নীরবে ডুবিয়া যাও। তখন দেখিবে, মানব-ঘৃণা কখনও তোমাতে সংক্রামিত হইবে না। অহেতুকী মানব-প্রেম ভিন্ন কেহ কখনও স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে নাই।

সকল উপদেশের সার উপদেশ—পরকে আপন করা—এবং আত্মাকে বিনাশ করা। আত্মজয় সকল জয়ের মূল,—আত্মজয়ে সিদ্ধি লাভ হইলে সিদ্ধার্থের অভ্যুদয় হয়। রাজগৃহ দরিদ্রের আবাস হয়—সাম্য এবং মৈত্রীর মহা মিলন হয়। ধর্ম্ম মিথ্যা কথা—যদি সে সাম্য ও মৈত্রীকে জাগাইতে না পারে। সাম্য ও

মৈত্রীর আবির্ভাব না হইলে কৃতঘ্নতার রাজ্যে কে শান্তচিত্তে জীবন ধারণ করিতে পারে? আত্মত্যাগ-মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে সংসারে চিরসুখের নিকেতনে পরিণত হয়। আত্মজয়ে সিদ্ধ নিষ্কাম পুরুষ দেখেন—সর্ব্বঘটে মা সর্ব্বমঙ্গলা—সকল অবস্থায়,সকল ঘটনায় তাঁহার লীলা প্রকটিত, কাহাকে আদর এবং কোন্‌টীকে ত্যাগ করিবেন? কাহাকে ত্যাগ করিলেই যে অংশের পূজা হয়, পূর্ণের পূজা হয় না। তিনি পূর্ণ—সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে, স্বাস্থ্য রোগে, আলিঙ্গন এবং নির্য্যাতনে। তিনি পূর্ণ অনন্ত প্রকৃতির অনন্তত্বে। বিরোধী-ক্ষেত্রে সমজ্ঞানের উদয় হইলে দুঃখ সুখে, বিপদ সম্পদে, রোগ স্বাস্থ্যে, নির্য্যাতন আলিঙ্গনে পরিণত হয়, তখন সাম্যের মঙ্গলময় বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠে, সর্ব্বঘটে মা সর্ব্বমঙ্গলার আবির্ভাব দেখিয়া সাধক কৃতার্থ হন। এই নিত্যানন্দ ধামে কৃতজ্ঞতা এবং কৃতঘ্নতা এক সোপানের দুই শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হয়, সাধক নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার-চিত্তে সকল সুখ দুঃখ রূপ সোপান অতিক্রম করেন। তাহাই বৈকুণ্ঠের চিদ্‌ঘন আনন্দ-রাশি। কবে বিধাতা মানবকে সেই ধামের উপযোগী করিবেন?

আসল মানুষ।

১

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর,
তাইত তোমরা সবার রাজা বিরাট পৃথিবীর।
তোমরা তুলসে বজ্রবাহু, ডরে কাঁপে শনি রাহু,
পুচ্ছ তুলে পলায় কেতু আতঙ্কে অস্থির।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

২

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে, তোমরা বেড়াও অসুর বলে,
পশুর মত চরণ তলে সবাই নতশির।
কোথায় মেরু কোথায় মরু, নাই যেখানে তৃণ তরু,
তোমরা সেথায় মহান রাজা তুহিন হিমানীর।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

৩

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।
তড়িৎ অনিল অহরহ, ভৃত্য বাহন আজ্ঞাবহ,
শ্বেত সূর্য্য উজ্জ্বলিছে প্রতাপ প্রতিচীর।
ইন্দিরা আর শ্বেতভুজা, ধনে জ্ঞানে কচ্ছে পূজা,
পূবের দেশের তুচ্ছ কুবের গুরু নতশির।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর,
বাঁচ্‌তে তোমরা লজ্জায় মর, মর্‌তে তোমরা গর্ব্ব কর,
মৈনাক ডোবা ডেমাক নয় সে সূর্য্যভেদী শির।
যেমন পুরুষ তেমনি নারী, সমান সাহস দুজনারি,
সাত সাগরে পায় না পারি—কূল—কিনারা—তীর।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

৫

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর?
ডুব্‌ছ যখন টিটানিক, তোমরা তখন বৃটানিক,
অবিচল-চিত্ত ঠিক অচল অটল স্থির।
বাজ্‌ছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড, মৃত্যু কচ্ছে সেক্‌খ্যাণ্ড,
কেমন গ্র্যাণ্ড অভ্যর্থনা অকূল জলধির।
উঠছে গম্ভীর বিজয় গান, আকাশ পাতাল কম্পমান,
লুপ্তবীর্য্য সুপ্ত প্রাণ জাগ্‌ছে অবনীর।
কি উল্লাসে ক্ষিপ্ত বিশ্ব, ভূতলে কি অতুল দৃশ্য,
ভ্রাতা ভগ্নী পত্নীপুত্র বিদায় প্রণয়ীর!
কি আলিঙ্গন পরস্পর, নন্দনে কি উঠ্‌ছে ঝড়,
ক্রন্দনের নাই কাতর স্বর, নীরব সুগম্ভীর,
প্রেমের সীমা, মুখের কথা নাই সে নিরাশ ব্যাকুল বাধা,

ভীষণ সাহস, নির্ভীকতা—ধৈর্য্য হিমাদ্রির।
তে মরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

৬

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর
তোমাদের কি ডুবছে তরী? পাগলে কয়। হেসে মরি।
কাল্ সাগরে যাচ্ছে ভেসে কেতন বিজলীর।
অমর মথি ক্ষীরোদ সিন্ধু, পায়নি এমন রত্ন ইন্দু,
ইন্দ্রিরা অমৃত বিন্দু পুষ্প সুরভির।
কত রত্ন লক্ষ্মী ভরা, হৃদয়-সিন্ধু মথিত করা,
অতীত মরা জাতির সুধা পতিত অবনীর।
কি মহত্ত্ব, কি মহিমা, গৌরবের নাই পরিসীমা,
জগদ্দীপ্ত কিরণলিপ্ত বিজয় মাণিক্যের।
বণিক বৃটন তুমি ধন্য, পুণ্যকীর্ত্তি তোমার পণ্য
আন্‌লে আজ যে দেশের জন্য জীবন মূল্যে বীর,
ট্রিটানিক কি গর্ব্বে ঠাটে, লাগ্‌ল এসে তোমার ঘাটে
কোথায় এমন জয়ধ্বনি বিজয় তরণীর?
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

৭

তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।
কি মহত্ত্ব আন্‌লে দেশে, সঞ্জীবনী শক্তি বেশে,
এক জীবনে লক্ষ জীবন রুদ্র তেজস্বীর।
জন্মিবে ষ্টেড্ ঘরে ঘরে, শিশুর বেশে যীশুর বরে,
কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি ধর্ম্ম মূর্ত্তি বিশ্ব হিতৈষীর,
জন্মিবে স্মিথ শত শত, আত্মত্যাগী বীরব্রত
চরণ-তলে মরণ নত অচল অটল স্থির।
আমিত বুঝিনা নিজে, তোমার কাছে আমরা কি যে,
ক্ষোভে লাজে বক্ষ ভিজে চক্ষে বহে নীর।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

ম্যালেরিয়া রোগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (৩)

বিগত প্রবন্ধ দুইটীতে রোগাণুতত্ত্বের (Microbe in theory) বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছি, নিম্নলিখিত প্রবন্ধে সেগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট করিলাম—(১) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য হইতে একাধারে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্পন্ন গুণ বা কর্ম্মের উদ্ভব হইতেছে। আরোগ্য শক্তি জীবের দেহভ্যান্তর হইতেই উৎপন্ন। আরোগ্য শক্তির বীরুদ্ধবাদী রোগ শক্তির বিকাশ অন্যত্র হওয়া অযৌক্তিক। (২) জীবের জরা এবং রোগের ক্রিয়ানুযায়ী ফল প্রত্যক্ষ করিলে, একই উপাদানে গঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, গুরুত্বের মাত্রা ভিন্ন তাহাগিগের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। জরার উদ্ভব স্থান জীব দেহ, রোগও সেই বিধানের বহির্ভূত নহে। (৩) উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী-ভুক্ত জীব সমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পকে বিধ্বংসকারী এমন কোন প্রকৃতিগত বিরুদ্ধ বুদ্ধির স্ফুরণ এ জগতে আদৌ দৃষ্ট হয় নাই। অতএব বাহ্য জগতের নিম্নস্তরের মাইক্রোব জাতীয় রোগাণুর ও মানব জাতির সহিত রোগাণুতত্ত্বে কথিতরূপ বিরুদ্ধ ভাব থাকা সম্ভবপর নহে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বাত-পিত্ত-কফাদি ধাতুত্রয়ের বিকৃতিই রোগ এবং তথায় ধাতু ত্রয়কে ত্রিধারা-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অদ্য এই প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি আরও বিশদরূপে আলোচনা করিয়া অবশেষে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগ-জনিত জীবের রক্ত বা রসে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু লক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে যথা-সম্ভব বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

হিমালয়ের নানা প্রদেশাগত নানা নির্ঝরিণী-সম্মিলিত এক একটী কেন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যেমন স্বতন্ত্রভাবে উদিত

হইয়া তরঙ্গায়িত কলেবরে সবেগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে উপস্থিত হয় এবং সেই সঙ্গম স্থলে তিনটী স্রোত জলকল্লোল-সহ সংমিশ্রিত হইলেও প্রত্যেকটী যেমন রেখাঙ্কন দ্বারায় পৃথক, তেমনি, ত্রিবিধ কোষ রাজ্য হইতে নিঃসৃত সূক্ষ্ম বাত, পিত্ত,কফাদি ধারা হৃদপিণ্ড রূপ ত্রিবেণী-সঙ্গমে একত্রিত হইয়া ক্রমশঃ অনেকটা স্থূলাকারে শিরা হইতে শিরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জীবদেহ মধ্যে তিনটী কোষ-রাজ্য আছে, বাত-কোষ রাজ্য, (Nerve-cell area) পিত্ত-কোষ-রাজ্য (Bilious cell area) এবং কফ-কোষ-রাজ্য (Lymphatic cell area) এক একটী কোষ রাজ্য এক জাতীয় কোষ সমূহের সমষ্টি মাত্র। জীবদেহস্থ বাতকোষ-রাজ্য, পিত্ত-কোষ-রাজ্য এবং কফ-কোষ-রাজ্য হইতে বাত, পিত্ত এবং কফ স্রোত বৈদ্যুতিক ত্রিধার মত, উচ্চারিত শব্দের মত শক্তি রূপে অনরবত নিঃসৃত হইতেছে। তাহাই প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে রক্ত রসে প্রতিফলিত হয় এবং আমরা অঙ্গুলী স্পর্শে তাহাই অনুভব করি। বাত-কোষ রাজ্যের স্থূল বিকাশ মস্তিষ্ক ও তাহা হইতে উদ্ভূত স্নায়ুমণ্ডল। পিত্ত-কোষ রাজ্যের স্থূল বিকাশ যকৃৎ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য পরিপাক যন্ত্রাদি এবং কফ-কোষ-রাজ্যের স্থূলবিকাশ গ্রন্থি-মণ্ডল ও তৎসংযুক্ত শ্বেত রস-বহা নাড়ী প্রণালী সকল। বাত-কোষ-রাজ্য জীব দেহের মূল-শক্তি এবং অন্য দুইটী তাহার মিত্র-শক্তি মাত্র। বাত-কোষাদির ক্রিয়ার কোন বাহ্যিক স্থূল বিকাশ মানব চক্ষুতে কিম্বা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-দর্শনেও লিখিত হয় নাই , কিন্তু ইহার শক্তি-অমোঘ এবং সর্ব্বব্যাপী। জল ,বরফের আদি অবস্থা এবং জল ও বরফ দুইই স্থূল। জল হইতে যে বাষ্প হয়, তাহা সূক্ষ্ম কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে নহে। কারণ ইহার শক্তি অচিন্তনীয় নহে বিদ্যুৎ বাষ্প অপেক্ষা অনেকটা সূক্ষ্ম, কিন্তু ইহাতেও স্থূলত্বের আভাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাও অচিন্তনীয় বা সর্ব্বশক্তিমান নহে। কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রপ্রতিমুখী শক্তি, যাহার স্থূলত্ব অচিন্তনীয় অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বই যাহার অভিব্যক্তি, তাহা অনেকটা সর্ব্বশক্তিমান। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যে,স্থূলত্ব যতই সূক্ষ্মত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জীবদেহের বাত রাজ্যই সর্ব্বশক্তিমান, কারণ তাহার ক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তাহার শক্তি রোগ এবং অসুস্থতারূপ বহু আপদ বিপদ, ঝড় এবং ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও ধীর এবং স্থির ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। রোগ যতই বিষম হউক না কেন, জীবদেহের বাত রাজ্য সর্ব্বশেষে আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হইলে সে রোগ-মুক্তির আশা অনেকটা দুরাশা হইয়া পড়ে। যে রোগে প্রথমতঃ বাতরাজ্য আক্রান্ত হইয়া উদ্ভূত হয়,তাহার শেষ ফল প্রায়ই মৃত্যু। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সার্ব্বভৌম শক্তি প্রথম হইতে আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলে কিম্বা মিত্র-শক্তি অর্থাৎ পিত্ত কফ ধাতু পরাজিত হইয়া সার্ব্বভৌম শক্তি অর্থাৎ বাত-ধাতু আক্রান্ত হইলে জীব ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া থাকে। বাত-কোষ-রাজ্যের স্ফূরণের জন্য বিশেষ কোন স্থূল রস বা স্রাবের আবশ্যক হয় না। শুধু একটা শুষ্কতা সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, তৎসহ বাত শক্তি-পুঞ্জ কেন্দ্রাভিমুখী বা কেন্দ্র-প্রতি-মুখী শক্তির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া জীবের সমগ্র দেহের প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

এই শক্তির বা ভাবের অঙ্কন আলো ও বস্তু-অবয়বের সংমিশ্রণে যে ফটগ্রাফিক প্লেট প্রস্তুত হয়, তাহার ন্যায় রক্তের মধ্য দিয়া অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। পিত্ত-কোষ-রাজ্যের যন্ত্রাদির মধ্যে যকৃতই সর্ব্ব প্রধান এবং পরিপাক ক্রিয়ার সমাধন হেতু সেই যকৃত হইতে ক্ষণে ক্ষণে পিত্ত রস নিঃসৃত হইতেছে। এই পিত্ত শোধিত আহার্য্য বস্তু অনবরত রক্তের সহিত মিলিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, যকৃতের রুগ্নাবস্থাতেও তাহা হইতে নিঃসৃত বিকৃত পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় চালিত হয় এবং জীব দেহকে হরিদাভ করিয়া তোলে। আমরা পিত্তবিকারের স্থূলবিকাশ তিক্ত আস্বাদনেও অনুভব করিয়া থাকি। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পিত্ত, কি সুস্থ, কি অসুস্থ অবস্থায়, প্রতিনিয়ত কখনও সূক্ষ্ম, কখনও বা স্থূল আকারে রক্তে প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং তাহারই আভাস আমরা নাড়ীতে পাইয়া থাকি। শারীরিক ক্রিয়াতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, পিত্ত শোধিত আহার্য্য বস্তু আংশিক ভাবে রক্তে পরিণত হয়। কফ কোষ রাজ্যে গ্রন্থি সমূহের অভ্যন্তর দিয়া যে শ্বেত রস-স্রোত শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়,সেই শ্বেত রস ক্রমশঃ আংশিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। কারণ আমরা শারীর বিজ্ঞান পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, Lymph গ্রন্থির মধ্যস্থ শ্বেত কণিকাই রক্তের লাল কণিকায় পরিণত হয়। অতএব যে শোণিত শোধিত পিত্ত এবং শ্বেত রস হইতে উদ্ভূত, তাহাতে পিত্তাত্মক এবং শ্বেত-রস-রূপ শ্লেষ্মাত্মক গুণাদির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। বাত পিত্ত-শ্লেষ্মাদির নাড়ী-মধ্যস্থ সূক্ষ্মাকৃতি যেমন পৃথক, বাহ্যাকৃতিও সেইরূপ,যথা বাতে মুখগহ্বরের শুষ্কতা, পিত্তে তিক্ত, এবং শ্লেষ্মায় মিষ্টাস্বাদন প্রভৃতি। আমরা বুঝিলাম, স্থূল ভাবে ধাতু কি। এখন দেখা যাউক, স্থূলভাবে ধাতু-বিকৃতি কাহাকে বলে এবং কি ভাবে তাহা হইতে রোগের উৎপত্তি হয়। জীবদেহ ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র কোষ সমূহের সমষ্টি মাত্র। কি রস, কি রক্ত, কি মেদ, কি মাংস, কি অস্থি, কি স্নায়ু, সমস্তই কোষ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এবং পৃথকীকৃত কোষ-গুচ্ছের ক্রিয়া এক একটী গুচ্ছ কোষের উপর নির্ভর করে। কোষই সকল ক্রিয়ার স্রষ্টা। সেই ক্রিয়ার স্ফুরণ প্রথমতঃ সূক্ষ্ম এবং অবশেষে স্থূল ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবদেহের সাধারণ অপক্ক রস কোষের বিশ্লেষণ ক্রিয়ার দ্বারাই অবস্থা ভেদে বিশিষ্ট পক্ক, অপক্ক সুস্থ, অসুস্থ, বিকৃত, অবিকৃত রসে পরিণত হইতেছে। যে যকৃত-কোষ পিত্ত নিঃসারণ দ্বারায় পরিপাক কার্য্য সুসম্পন্ন করে, সেই কোষই আবার বিকৃত পিত্ত ও শর্করা প্রভৃতি ক্ষরণ করতঃ জীব-দেহের ধ্বংস সাধন করিতেছে। যে পাকস্থলী-কোষ অম্ল উদ্গারণের দ্বারায় পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, সেই কোষই আবার বিকৃত অম্ল উদ্গীরণ করতঃ বাত-শূলাদি রোগ সৃষ্টি করিয়া জীবদেহকে মৃত্যুর সন্নিকট করিতেছে। যে মূত্রযন্ত্র-কোষ এল্‌বুমেন জাতীয় পদার্থের পথরোধ করিয়া এবং ইউরিয়া জাতীয় পদার্থ নিষ্কাশিত করিয়া জীবদেহের সুস্থতা ও সমতা সম্পাদন করে, সেই কোষই আবার এল্‌বুমেন জাতীয় পদার্থ নির্গত এবং ইউরিয়া জাতীয় পদার্থের পথ-রোধ করতঃ জীবকে মরণের পথে অগ্রসর করিতেছে। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু অসৎ, যাহা কিছু স্বাস্থ্য-

কর, যাহা কিছু অস্বাস্থ্যকর, যাহা কিছু জীবন, যাহা কিছু মরণ, সকলই কোষের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে জীবন ও মরণ, স্বাস্থ্য ও রোগ কোষের বিরুদ্ধ জাতীয় ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। কোষের উপরোক্ত দ্বিবিধ ক্রিয়ার একটী স্বাস্থ্যকর দহন এবং অন্যটীকে অস্বাস্থ্যকর দহন নামে অভিহিত করা যায়। স্বাপক্ষ, স্বাস্থ্যকর বা স্বাভাবিক এবং বিরুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর বা অস্বাভাবিক দাহন ক্রিয়া হইতে স্বাপক্ষ বা বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট স্রাব বা পদার্থ প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিক দহন ক্রিয়া হইতে যে পিত্ত, শর্করা, এল্‌বুমেন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহা জীবদেহের রক্ষণ এবং পুষ্টি সাধন করে। অস্বাভাবিক দহন হইতে যে বিকৃত পিত্ত-শর্করা, এল্‌বুমেন ইত্যাদি উদ্ভূত হয়, তাহা তাহাদিগের বিশিষ্ট ক্রিয়া দ্বারায় প্রতি মুহূর্ত্তে জীবদেহের ক্ষয় করিয়া থাকে। শারীরিক কোষ হইতে বিরুদ্ধ দহন ক্রিয়া নিম্নলিখিত কারণের সাহায্যে জীবদেহ মধ্যে জন্মিয়া থাকে। —(১) পৈতৃক বা জন্মার্জ্জিত, (২) দৈহিক বা স্বকৃত, (৩) সাময়িক।

পৈতৃক।—আমরা জীব, আমরা আমাদিগের পিতা মাতার প্রকৃতি-দেহ-গঠিত উপাদান এবং আহার্য্য বস্তুর সারাংশের সমষ্টি মাত্র, অর্থাৎ জীব পিতা মাতার স্বরূপ বা ছায়া মাত্র। আয়নায় কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, প্রতি-ছবি যেমন তাহার সমস্ত আকার, প্রতিবিন্দু, প্রতিসূত্র অনুকরণ করে, তেমনি, পিতা মাতার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আকৃতি বা প্রকৃতি এবং দেহ-ঘটিত উপাদানের প্রত্যেক অণু পরমাণুর সহিত সন্তানের অচ্ছেদ্য সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা সাধারণত দেখিতে পাই যে, পিতা মাতার কোন অঙ্গ বিকৃত থাকিলে সন্তানেও সেই সেই অঙ্গের বিকৃতি থাকে। পিতা মাতার হস্তের অঙ্গুলীর পাঁচ অপেক্ষা অধিক, পাঁচ অপেক্ষা ন্যূন কোন স্থানে অর্ব্বুদ এবং গর্ম্মি, গনোরিয়া, যক্ষ্মা রোগ থাকিলে সন্তানেও সেই সকল বর্ত্তমান বা বীজরূপে নিহিত থাকিতে দেখা যায়। সন্তান যেমন পিতা মাতার তৈজস পত্রের উত্তরাধিকারী, সেইরূপ,রোগ,ব্যাধি, অসুস্থতা প্রভৃতিও দখল করিতে থাকে। জীব পিতা মাতার অণু পরমাণুরূপ দেহ উপাদান লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদিগের সঞ্চিত রোগাদি কখনও বীজ বা ফলরূপে দেখা হয়। পিতা মাতা হইতে অর্জ্জিত রোগাদির আভাস সাধারণ বা বিশিষ্ট ভাবে দেহ-কোষাদির উপর পতিত হইয়া থাকে। দৈহিক বা স্বকৃত মানবসমাজ তাহাদিগের আদিম অবস্থা হইতে যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহাদিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধির বিপর্য্যয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন-জনিত মানসিক বৃত্তি সমূহের অধঃপতন আনয়ন করে। মানসিক অধঃপতনে চরিত্রের অধঃপতন এবং চরিত্রের অধঃপতনেই আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যভিচারের সৃষ্টি করিতেছে। শারীরিক ব্যভিচারাদি, যথা মদ্যপান, অতিরিক্ত বেতঃপাত, অখাদ্য কুখাদ্য ভোজন ইত্যাদি সমগ্র দেহস্থিত কোষ সমূহকে সাধারণ ভাবে এবং কোন কোন যন্ত্রকে বিশিষ্ট ভাবে জর্জ্জরিত করিয়া থাকে।

সাময়িক।—জন্মার্জ্জিত বিষ ছায়া রূপে সমগ্র দেহে প্রতিফলিত হয়। স্বকৃত ব্যভিচার সেই ছায়াকে প্রতিবিম্বে এবং অবশেষে পিত্তাদি পরিবর্ত্তন, অতিরিক্ত পানাহার

প্রভৃতি সাময়িক উত্তেজনা রূপে প্রতিবিম্বকে মূর্ত্তিমতী আলেখ্যে পরিণত করে। জন্মার্জ্জিত এবং সকৃত ব্যভিচার দোষে জীবদেহ মধ্যে রোগাগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে এবং সাময়িক উত্তেজনা রূপ ফুৎকারে সেই অগ্নি অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একই রস যাহা শরীর ধারণ করে, শরীর সুস্থ রাখে, এবং শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই আবার সময়ে শরীরের অসুস্থতা আনয়ন বা শরীরের শক্তি ক্ষীণ, এবং এমন কি, জীব-দেহ ধ্বংস পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। যে রস জীব দেহ ধারণ, আবার অবস্থা ভেদে জীব দেহ নাশ করে, তাহা যে ভিন্ন বা বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আগুনের বিরুদ্ধ জল যেরূপ,সেইরূপ, জীবন ও মৃত্যুর বিরুদ্ধ গুণ। কারণ জল প্রযোগে যেমন আগুন, জীবনী শক্তির বিকাশে তেমনি মৃত্যু অপসারিত এবং মৃত্যু শক্তির বিকাশে তেমনি জীবন নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আমরা দেখিলাম যে, রস হইতে উদ্ভূত জীবন ও মৃত্যুরূপ ফল এক অন্যের বিরুদ্ধ। এবং দ্বিবিধ সুস্থ ও বিকৃত রস অবস্থা ভেদে শারীরিক রোগ হইতেই জন্মিতেছে। অতএব এই দ্বিবিধ রসের উদ্ভব কোষাদির বিরুদ্ধ জাতীয় ক্রিয়া হইতে হইতেছে। এই বিরুদ্ধ জাতীয় ক্রিয়ার একটী স্বাপক্ষ-কোষক্রিয়া এবং অন্যটীকে বিরুদ্ধ-কোষ ক্রিয়া কহে। ইহার একটী জীবন, অন্যটী মৃত্যু, একটী সুস্থতা, অন্যটী অসুস্থতা, একটী স্বাস্থ্য অন্যটী রোগ। এই কোষ সমূহের ক্রিয়া জীবদেহের উপর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব এবং আধিপত্য স্থাপন করিয়া আছে। এই সুস্থ বা স্বাভাবিক ক্রিয়াই সুস্থ ধাতু এবং বিভিন্ন জাতীয় ক্রিয়াই বিভিন্ন বাত, পিত্ত, কফাদি ধাতু নামে অভিহিত। বিকৃত রস সামান্য শক্তির কারণকে কিরূপ গুরুতর ব্যাধিতে পরিণত করে, তাহার একটী একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। একটী যুবক অনেক দিন যাবত অম্লরোগে ভুগিতেছিল। তাহার মুখনিঃসৃত লালার অম্লত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আহার করিবার সময় দন্ত দ্বারায় হঠাৎ তাহার মুখ গহ্বরের নিম্নদেশ অর্থাৎ নিম্ন ওষ্ঠের উপরে এক স্থানে আঘাৎ লাগে। ক্রমশঃ সেই অম্ল লালার উত্তেজনায় এই ক্ষত স্থান হইতে একটী বর্দ্ধনশীল অর্ব্বুদ গজাইয়া উঠে। অর্ব্বুদটী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারায় সেইটীকে উৎপাটিত করা হয়। অর্ব্বুদটীর আকার বড় মার্ব্বেল অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়াছিল। কিন্তু এই লালা তাহার সুস্থ অবস্থায় মুখগহ্বরের ঝিল্লিকে সুস্থ রাখে এবং কোন ক্ষত হইলেও এরূপ ভাবের অর্ব্বুদাকারে ঝিল্লির বৃদ্ধি করিয়া থাকে না, বরঞ্চ তাহাকে আরোগ্য করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিলাম যে, স্বাভাবিক এবং বিকৃত রসের গুণ ও ক্রিয়া কত বিভিন্ন। বিকৃত পিত্ত, শর্করা, এলবুমেন, অম্ল ইত্যাদি যেমন এক একটা বিষ, সেইরূপ, শরীরের কোষ সমূহের অন্যান্য রূপ বিকৃত ক্রিয়া হেতু অন্যান্য নানা প্রকারের বিষও জন্মিতে এবং তাহা হইতে মৃত্যু আসিতে পারে। এই সকল কোষ হইতে উদ্ভূত বিষ ইয়ত পূর্ব্বোক্ত বিকৃত পিত্ত, শর্করা, এলবুমেন ইত্যাদির মত স্থূল নহে এবং তজ্জন্য ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারায় তাহাদিগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা অসম্ভব। কারণ মল মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদির মধ্যে এমন অনেক বস্তু সূক্ষ্ম

এবং স্থূল বুঝিয়া গিয়াছে, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন রাসায়নিক বা আণুবীক্ষণিক দর্শনেও নির্ণয় করা যায় নাই। এতএব সূক্ষ্মরূপে রোগের কারণ শরীরাভ্যন্তর হইতে উদ্ভূত হয়, বাহ্যিক স্থানীয় অসুস্থতা এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন গৌণ কারণ রূপে কার্য্য করে।

আমরা বিজ্ঞানোন্নত সভ্যতার তীব্র কিরণ জালে সমাচ্ছন্ন। আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোক-রশ্মির আঘাতে অন্ধপ্রায়। প্রকৃতি কি, আমরা চিনিব কিরূপে? জগন্ময়ী বিশ্বরূপিণী একই প্রকৃতি সর্ব্বত্র বিরাজমান—কি জীবে, কি উদ্ভিদে, কি বাহ্য-জগতে তাঁহারই সর্ব্বময় মূর্ত্তি নানা রূপে প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই। জীবে এবং উদ্ভিদে বাত পিত্ত কফাদি রূপে এবং বাহ্য জগতে বায়ু, অগ্নি, জলরূপে তাঁহার উন্মেষ। ঐ দেখ পাঠক, চক্ষুর নিমেষে আকাশ, পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত হইয়া আসিল, ঐ দেখ বৈদ্যুতিক আগ্নেয় উচ্ছ্বাস চক্ষু ঝলসিয়া ফেলিতেছে, ঐ শুন মেঘগর্জ্জনের ভীষণ কড় কড় শব্দে কর্ণ-কুহর বধির করিতেছে—আবার দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের আলোড়ন আসিয়া ঘর, বাড়ী, ইমারাৎ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, তৃণ পর্য্যন্ত কতক ছিঁড়িয়া, কতক উৎপাটিত করিয়া, কতক বিধ্বস্ত করিয়া, কতক উড়াইয়া প্রকৃতি আপনার বৈকারিক তেজস্বিতার বিকাশ করিতেছে, ঐ দেখ, প্রকৃতি আবার স্থির, শান্ত, তাহাতে প্রলয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। সেইরূপ, জীবদেহও বাতের প্রবল বেগে আলোড়িত হইয়া কখন বিধ্বস্ত, কখনও উৎপাটিত হইয়া থাকে। কোন অজানিত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ঐ যে আগ্নেয়গিরি অকস্মাৎ ভীষণ গর্জ্জনের সহিত অনর্গল ধূমাগি উদ্গীরণ করিয়া গলিত ধাতু-স্রোতে চতুর্দ্দিক ভস্মীভূত করিয়া কত জনপদ ধ্বংস ও ভূগর্ভে নিহিত করিয়া, ভূকম্পনে সমস্ত প্রদেশ প্রকম্পিত করিয়া প্রকৃতি আপনার বিকৃত শক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে, আবার ঐ যে চতুর্দ্দিক নির্ব্বাত, সেথায় ভীষণতার উশৃঙ্খলতার লেশমাত্র পাই। তেমনি, পিত্ত রূপ অগ্নির তেজে কত জীব-দেহ ঝলসিত বা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। কোন অজ্ঞাত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে রাশি রাশি তুষার-স্তূপ সহসা গলিয়া জলপ্রপাত রূপে পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া, চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া, কত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া, জলপ্লাবনে নদ নদী, দুকূল ভাসাইয়া কত সহর পল্লী ডুবাইয়া প্রকৃত আপনার অস্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ করিতেছে। আবার ঐ দেখ মুহূর্ত্তে সকলই শুকাইয়া গেল। ঐ প্রচণ্ড প্রপাত ঝির ঝির করিয়া বহিতে লাগিল, তাহার ভীষণতা কোমলতায় পরিণত করিল। শ্লেষ্মারূপ জলোচ্ছ্বাস তেমনি অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া কত জীবদেহকে ডুবাইয়া বা ভাসাইয়া লইয়া থাকে। ঐ ঝঞ্ঝাবাত, অগ্ন্যুৎপাত এবং জল প্লাবনের বিজ্ঞান কি? এই তিনটা ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিকৃতি এবং অসামঞ্জস্য ভাবই কারণ রূপে সকলের মূলে নিহিত রহিয়াছে। অবিকৃত বায়ু, (বাত) অগ্নি (উত্তাপ) এবং জল (শৈত্য) ইত্যাদির প্রাকৃতিক সমতার অভাবই ঝঞ্ঝাবাত, অগ্ন্যুৎপত এবং জলপ্লাবনের মূলীভূত কারণ। বাহ্য জগতে যাহা ঝঞ্ঝাবাত, অগ্ন্যুৎপাত এবং জলপ্লাবন, জীবের আভ্যন্তরিক জগতে তাহাই রোগ নামে অভিহিত। এই প্রাকৃতিক বৈষম্য জীবদেহে দূষিত রসের সৃষ্টি করে। তুষাগ্নি যেমন বায়ুর ফুৎকারে জ্বলিয়া

উঠে, রোগবিষও জীবদেহে সঞ্চিত হইয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে, এবং হঠাৎ সহকারী কারণ সংযোগে বিকাশ পায়। সর্ব্বক্ষণে জীবনী-শক্তি অর্থাৎ দেহভ্যন্তর-নিহিত প্রকৃতি রোগবিষের শক্তি দমনে সচেষ্ট থাকে। রোগ-বিষ প্রবল হইয়া উঠিলে জীবনী-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া থাকে এবং রোগ-লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। তখন জীবনী-শক্তি পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হয়। রোগে বিকাশও জীবনী-শক্তির ইঙ্গিত। বর্ষার জল মন্দীভূত বেগে সহর পল্লী ভাসাইতে থাকে, বাঁধ বাঁধিয়াই তাহার গতি-রোধ করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু জলোচ্ছ্বাস নব বলদৃপ্ত ঐরাবৎ আকারে এবং সবেগে ছুটিতে থাকিলে, যাহার সম্মুখে সমস্ত বাঁধা প্রতিবন্ধক তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সেখানে নালা কাটিয়া জল অপ-গমের চেষ্টাই প্রশস্ত। বাঁধ বাঁধিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। সেইরূপ জীবনী-শক্তি অজীর্ণে অতিসার রূপে, পাথরিতে ঘন ঘন প্রস্রাব আনিয়া, ফোটকে পুঁজ আনিয়া ও ফাটাইয়া, আপনাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে। রোগ-বিষের উগ্রতা অল্প হইলে সক্ষম এবং অত্যধিক হইলে অক্ষম হইয়া পড়ে। এবং তখনই ঔষধাদি বাহ্যিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক। ঔষধাদি সহকারী রূপে কার্য্য করে মাত্র, মূলে জীবনী-শক্তি দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট মল মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি নিষ্ক্রান্ত করিয়া জীব-দেহকে রোগ হইতে মুক্ত করে। রোগ মুক্তির পর আমরা নব কলেবর প্রাপ্ত হই। এবং রক্তের বহুদিন সঞ্চিত দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। রোগের বিকাশই রোগ মুক্তির হেতু। ধাতু-বিকৃতি কাহাকে কহে এবং কি ভাবে তাহা হইতে রোগের উৎপত্তি হয় সে সকল বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। আপাততঃ রোগাণু কি, এবং কি রূপে রুগ্ন জীব শরীরে ইহারা জন্মিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিচার করিব।

আমরা দেখিয়াছি যে, দেহস্থ কোষে স্বাস্থ্য-কর অস্বাস্থ্যকর, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, অবিকৃত, বিকৃত রস কিম্বা পদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আছে। আমরা এখন দেখাইব যে, দেহ-কোষ স্বাস্থ্যকর, স্বাভাবিক, অবিকৃত জীবাণু প্রস্তুত করিতেও সক্ষম। পরে দেখাইব, দেহ-কোষের বিকৃত জীবাণু প্রস্তুত করা সম্ভবপর, অসম্ভব নহে। আমরা শারীর বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, শারীরিক সুস্থ রস হইতে জীব-দেহ মধ্যে অজস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু, যেমন নানা আকার ও প্রকারের শ্বেত কণিকা, স্ত্রী বীজ এবং পুরুষ বীজ ইত্যাদি অনবরত জন্মি-তেছে। তাহারা জীবিত, তাহাদিগের চলন শক্তি আছে, তাহাদিগের আকার পরিবর্ত্তন এবং আপনাকে অনন্ত ভাগে বিভক্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা মহা শক্তিশালী ব্যষ্টি-কোষ মাত্র। আমরা দেখিলাম যে, কোষ সমূহ বিরুদ্ধ ক্রিয়া-বিশিষ্ট রস এবং স্বাপক্ষ ও স্বাস্থ্যকর জীবাণুর উদ্ভব করিতে সক্ষম। অতএব উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ঐ কোষ সকলের নিদান সম্পর্কীয় জীবাণুও প্রস্তুত করি-বার শক্তি আছে। এই নিদান-সম্পর্কীয় (Pathological) জীবাণু কোষ-সমূহের বিরুদ্ধ জাতীয় ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। এই জীবাণু সমূহ অত্যন্ত বিষাক্ত ও পচন জাতীয়, যেমন কলেরা, টাইফয়েড ফিভার, টাইফাস ফিভার ইত্যাদি রোগেই লক্ষিত হয়। অন্যান্য সামান্য সামান্য রোগে আদৌ দেখা যায় না। এই সকল রোগে পচনের লক্ষণ সমূহ, যেমন দুর্গন্ধ মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি, দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে

এ গুলির দুর্গন্ধের মাত্রা এত অধিক হয় যে, কোন লোক রোগীর গৃহ মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। রোগে যেমন মাংসপেশী, চর্ম্ম, অস্থি ইত্যাদি পচিয়া থাকে, সেইরূপ, জীবদেহ-মধ্যস্থ রস কিম্বা রক্তও পচিতে পারে। বাহ্য জগতের মৃত উদ্ভিদ্ বা জীব পচিলে যেমন জীবাণু উদ্ভূত হইতে দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ, জীবদেহস্থ মৃতাবস্থাপন্ন রস বা রক্ত পচিয়া নিদান-সম্পর্কীয় জীবাণুর সৃষ্টি করিতে পারে। বাহ্য জগতের পচন হইতে উদ্ভূত জীবাণু যেমন তথা-জনিত বিষাক্ত পদার্থ আহার করিয়া বাহ্য জগতকে পরিষ্কৃত এবং পূত করে, জীব দেহের অন্তর জগতেও ঠিক সেই-রূপ। জীবজগৎ, এ জগৎ ছাড়া নহে, যাহা বাহ্য জগতে সম্ভব, তাহা অন্তর জগতেও সম্ভব। এই পৃথিবীর আজন্ম-সঞ্চিত ক্লেদ, ময়লা, আবর্জ্জনা, মল, মূত্র ইত্যাদি যদি ক্রমশঃ স্তূপীকৃত হইত, কুক্কুর, শৃগাল, শকুনী, গৃধিনী রূপ ময়লা বাহক যদি সৃষ্টি না হইত, বাহ্যিক পচন হইতে যদি জীবাণু উদ্ভূত না হইয়া দূষিত পদার্থকে মৃত্তিকায় পরিণত না করিত, তাহা হইলে ময়লা-স্তূপের ঘোর অন্ধকারে এই পৃথিবী আবৃত হইয়া যাইত, নরকের পূতিগন্ধযুক্ত বাতাস পৃথিবীর চতু-র্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, নরকের বিভী-ষিকায় এ পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিত, অস্বাস্থ্যের প্রতিছায়ারূপে এই প্রকৃতি নির্জ্জীব রুগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিত। সেই ছবির মলিন ছায়া জীবের দেহে প্রতি-ফলিত হইত। কিন্তু হায়। ভগবান-প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়মরূপ অজস্র সিঞ্চিত অপার করুণা-ধারায় প্রকৃতি তাহার পুরাতন ক্লেদ হইতে বিমুক্ত এবং বিধৌত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন এবং পবিত্র জীবন লাভ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে,নানা রোগে নানা প্রকা-রের নিদান সম্পর্কীয় জীবাণু কোথা হইতে আসে? যেমন বহির্জগতস্থ নানা জাতীয় পদার্থ পচিয়া নানারূপ জীবাণুর আবির্ভাব হয়, তেমনি শরীরাভ্যন্তরেও নানা বস্তু-অঙ্গের পচনে বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর উৎপত্তি হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-যুগে, যে যুগে রোগাণুসম্পর্কীয় নিদানতত্ত্বের আবিষ্কারে জগৎ আলোকিত এবং স্তম্ভিত, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সে যুগে এ প্রবন্ধের স্থান কোথায়? অমানুষিক ধী-সম্পন্ন বিশ্বাতীয় প্রবীণ নিদান-তত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণা এবং পরীক্ষার পর যে তত্ত্ব-সূত্রগুলি উদ্ঘাটনে সফল-মনোরথ হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আমার মত অল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কলম চালনা ধৃষ্টতা-মাত্র। তবে প্রবন্ধের সাধারণভাবের অতিরিক্ত একটী বিশেষত্ব আছে,তাহা এই,—অধুনা দুর্ভিক্ষরূপ এবং মৃত্যুরূপ বিপ্লব এই পুণ্য-তীর্থ-ভারত-বর্ষকে অহর্নিশি মথিত করিতেছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা দুর্ভিক্ষাদি সমাজ-ধ্বংসকারী মন্ত্রির বিভীষিকা দেখিয়া ভীত এবং আড়ষ্ট হইতেছি। আবার তৎসহ রোগাণু রূপ রাক্ষস-গণের লোলুপ-দৃষ্টির সংযোজনাতেও আমাদি-গের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,—মনে হয়, যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক পলে, মৃত্যুর কঠোর স্পর্শ অনুভব করিতেছি। রোগও মানব-চিত্তকে এতদূর সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না। রোগের চিন্তা রোগ জন্মিলে। এই জীবাণু রূপ রোগের নিদান-তত্ত্ব প্রচারে আমাদিগের মনে হইতেছে যে, মৃত্যু আমাদিগের পশ্চাতে, সম্মুখে, পার্শ্বে, জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। হায়, ভারতবাসি! তোমরা দুর্ভিক্ষে, রোগে,

শোকে জরা-জীর্ণ, আবার নূতন প্রকার বিভীষিকায় বিক্ষিপ্ত। এই সুখ অপেক্ষা শান্তিই উত্তম। এই নিদানরূপ আলোক অপেক্ষা অন্ধকারই শ্রেয়। যে আলোকে শত সহস্র দুর্ব্বিসহ অন্ধকারের ছায়াপাত হইতেছে, সে আলোক অপেক্ষা অন্ধকারই সুখপ্রদ। আমরা সাংসারিক দৈন্যতা-নিবন্ধন বিপদ্‌পাতের আতঙ্কে মূর্চ্ছিত এবং দেবতার রোষময় কটাক্ষের দারুণ-চিত্র অধুনা আমাদিগের চিত্রপটে সদাই প্রতিবিম্বিত। নূতন নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়া, এ জীবন আরও অসহনীয় করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা কি? যুক্তি-তর্ক দ্বারা রোগাণুর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে পাঠকই বিচার করিবেন। কিন্তু জীবাণুতত্ত্বের উদ্ঘাটন হেতু যে বিভীষিকা আমাদের মনোমধ্যে জাগরিত হইয়াছে, তাহার তীব্রতা কথঞ্চিৎও প্রশমন করিতে সমর্থ হইলে আমি আমার প্রবন্ধের সাফল্য মনে করিব।

শেষে দুই একটী কথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। কোন সুরসিক সমালোচক আমার এই সরস কাব্যের রস উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। যাঁহাদিগের সূক্ষ্মই আদি ও অন্ত, যাঁহাদিগের সূক্ষ্মই ধ্যান ও ধারণা, যাঁহাদিগের হৃদয় উদ্যান সূক্ষ্মের বিদ্যুৎছটায় চির-আলোকিত, চির বসন্তানিল-প্রস্ফুটিত পত্র ফুল ফলে সুশোভিত, বসন্তানিল-তাড়িত সুরভী-গন্ধে আমোদিত, সূক্ষ্ম-তত্ত্বের শান্ত-নির্ঝরিণীর ঝির ঝির শব্দে চির-মুখরিত, জানিতাম না সেই উদ্যান আজ পত্র, ফল, ফুল-হীন বালুকাময় শুষ্ক সাহারায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর, তাঁহারা যে সূক্ষ্ম-তত্ত্বের এই সরল আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, সে আমারই দুর্ভাগ্য। ভাবিয়াছিলাম, এখানে এই প্রবন্ধ শেষ করিব, কিন্তু আরও দুই চারিটী কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার।

বাসনা-বিজয়।

যখন মানব-চিত্ত ভগবদেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এবং তাহাতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রীতি কামনায় শরীর মন, হৃদয় এবং আত্মার কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয়, তখনই তাহার বাসনা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "তুমি যা বলিবে, তাই করিব, আমি কিছু না জানি," ইহাই ভক্ত-প্রাণের মর্ম্মবাণী। মানব যখন ইন্দ্রিয় এবং প্রবৃত্তির রাজ্যে আপনার আনন্দ, সৌন্দর্য্য, আরামের গৃহ রচনা করিতে থাকে, এবং সেই রচনা-কার্য্য যখন তাহার জীবনের পরম ব্রতে পরিণত হয়, তখনই সে "বাসনার দাস" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্থূল কথায়, মানব যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দময় রাজ্যে—কেবল সসীমের মধ্যে—প্রবৃত্তিময় ভোগের মধ্যে বাস করে, তখনই সে বদ্ধজীব। যখন মানব সসীম ছাড়িয়া অসীমে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিতে, অনাত্ম হইতে আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়, তখনই তাহার মুক্তাবস্থা। এইজন্যই প্রাচীন কালের

সর্ব্বদেশীয় সাধু ভক্তগণ বাসনা-বিনাশকে মুক্তির অবস্থা বলিয়াছেন।

সাধনার্থী সর্ব্ব প্রথমেই যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইয়া—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য জগতের আচার্য্যগণ উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, যাহা মন্দ বলিয়া, অহিত বলিয়া বুঝিবে, তাহা পরিত্যাগ এবং যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। কুবাসনাই পাপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক এবং সুবাসনাই পুণ্য কার্য্যের জনক। কুবাসনা প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া চিত্তকে কুপথে আকর্ষণ করে, সুবাসনা বন্ধুর ন্যায় হস্ত ধারণ করিয়া শুভপথে—পুণ্যধামে লইয়া যায়। এই কুবাসনা পরিত্যাগের নামই বাসনা-বিনাশ। বাসনা বিনাশের অর্থ চিত্তবৃত্তি নিরোধ নহে, চিত্তবৃত্তিকে অনীশ্বর পথ হইতে ঈশ্বর-পথে লইয়া যাইবার নামই বাসনা-বিনাশ।

আর এক দিক দিয়া দর্শন করিলে প্রত্যক্ষীভূত হয় যে, আমিত্ব বিনাশের নামই বাসনা-বিনাশ। আমি কর্ত্তা, আমি কর্ত্তা, আমি অনুষ্ঠাতা ইত্যাদি ভাব ঈশ্বর বিশ্বাস মূলক নহে। আমিই যদি সকল হইলাম, তবে আর ভগবানের স্থান কোথায়? ধর্ম্মরাজ্যে অহমিত্ব বুদ্ধিই নাস্তিকতা। এই আমিত্বের মূলেই ভীষণ অহঙ্কার। এই অহঙ্কার বুদ্ধি হইতে যে বাসনার উদ্ভব হয়, সেই বাসনাই মানব-চিত্তকে বিনাশের গর্ভে নিক্ষেপ করে।

বাসনাই চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ। চিন্তাপীড়িত চিত্ত ধ্যান করিবার অনুপযুক্ত। চঞ্চল জলরাশিতে যেমন চন্দ্র-প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয় না, তেমনি বাসনা কর্ত্তৃক অস্থির চিত্তে ভগবানের স্বরূপ-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে না। বাসনাধীন চিত্ত অশান্ত এবং অসমাহিত। অশান্ত চিত্তে ধ্যান ধারণা অসম্ভব। এজন্য বাসনা-বিনাশই ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। এই সাধনা জীবন-রাজ্যে যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, মন ততই ঈশ্বরীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বাসনা ধর্ম্মরাজ্যের দুর্দ্দমনীয় ভয়ঙ্কর শত্রু। বাসনার কঠোর হস্তে কত সাধকের আধ্যাত্মিক জীবন অকালে বিনষ্ট হয়, কত সাধক ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়া পুনরায় নিম্নদেশে নিক্ষিপ্ত হন। বাসনা ছায়ার ন্যায় নরনারীর পশ্চাতে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু বাসনা যতই বলবতী হউক, ঐশী শক্তিতে শক্তিমান সাধকের নিকটে তাহার পরাভব নিশ্চিত। বাসনা পরাভূত হইলেই মরুভূমি সদৃশ মানস-ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার মন্দাকিনীর স্রোতে ভক্তি-ফলদল প্রবাহিত হইয়া ভগবানের স্বরূপ-সাগরে উপনীত হইতে থাকে।

জগতের তিনজন মহাসাধকের জীবনে—আদর্শ সাধকের জীবনে বাসনা বিজয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথম বুদ্ধদেবের জীবনে, দ্বিতীয় যীশুখ্রীষ্টের জীবনে, তৃতীয় পুরাণ-কথিত মহাদেবের উপাখ্যানে। বুদ্ধদেব সুমহৎ সংকল্প সাধনের জন্য সংসার পরিত্যাগের আয়োজন করিলেন। নিশীথ সময় উপস্থিত। নর্ত্তকী বৃন্দ নৃত্যাবসানে নিদ্রামগনা। রাজপুরী নীরব, নিস্তব্ধ। সুসময় দেখিয়া সারথি ছন্দককে লইয়া তিনি চির জীবনের জন্য রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক সবিনয়ে সিদ্ধার্থকে সংসার পরিত্যাগ করিতে বারণ করিলেন, তদুত্তরে সিদ্ধার্থ এই মর্ম্মে আপনার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন:—"ছন্দক, অটল অচলের ন্যায় আমার প্রতিজ্ঞা

সুদৃঢ়। মোক্ষ-পথ নির্দ্ধারণে জীবন যৌবন সকলি উৎসর্গ করিয়াছি। দিঙ্মণ্ডল সংত্রস্ত করিয়া অশনি যদি আমার মস্তকে পতিত হয়, হিমালয় শৃঙ্গ স্খলিত হইয়া যদি আমার গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করে, জলরাশি সংক্ষোভিত হইয়া যদি মহা প্লাবন উপস্থিত করে, তথাপি আমার সংকল্প বিচলিত হইবে না। অতএব আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইও না। ছন্দক, তোমাকে অনুরোধ করি, এ সমুদয় কার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।"* সিদ্ধার্থ অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন। তখনই প্রলোভন—বাসনা "মার" আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধার্থ অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি রাজত্ব, রাজভবন, প্রাণপ্রিয়তমা পত্নী, স্নেহময় পিতা মাতা সকলি পরিত্যাগ করিয়া বাসনা-বিজয়ের পথে, নির্ব্বাণের পথে গমন করিয়াছেন। বাসনা কি সহজে দূরীভূত হইবে? সে প্রলোভন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত হইল। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন—"প্রলোভন, তুমি দূর হও। তুমি আমার কাছে এসো না।" সিদ্ধার্থের ধমকে প্রলোভন পলায়িত হইল। তিনি অশ্বারোহণে নক্ষত্র বেগে ছুটিলেন।

আবার যখন সিদ্ধার্থ গয়ার সাত মাইল দক্ষিণে নিরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ল গ্রামে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া আহারাদি আরম্ভ করিলেন এবং তদ্দর্শনে শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন মার আসিয়া হাসিমুখে এই মর্ম্মে বলিল—"আর কেন, এখন তোমার প্রিয় শিষ্যগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তুমি সন্ন্যাসীর আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছ, সাংসারিক লোকের ন্যায় ভোজন করিতেছ, এখন আমার কথা শুনিলেই ভাল হয়। তুমি এ পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার রাজত্বে প্রত্যাগমন কর।" সিদ্ধার্থ অন্তরে বলিলেন—"দূর হও মার। আমি তোমার কথায় ভুলিব না।" মার দমন হইল। কিন্তু মার তখনও সিদ্ধার্থের পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে একবারে পরিত্যাগ করে নাই।

ইতঃপর তিনি সেনানী গ্রামবাসিনী সুজাতা নাম্নী পবিত্র-হৃদয়া নারীর পরমান্ন ভোজন করিলেন। আহারান্তে মহা বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া পরমধ্যানী সিদ্ধার্থ এই সংকল্প গ্রহণ করিলেন:—"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক, অস্থি, মাংস ধ্বংস হউক, সুদুর্ল্লভ পরম জ্ঞান লাভ না করিয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে বিচলিত না হয়।" তখন মার মহা তেজের সহিত উপস্থিত হইল। মার বুঝিতে পারিল, এই তাহার শেষ আক্রমণ। এবার পরাভূত হইলে আর জয়ের আশা নাই, সিদ্ধার্থ অবলীলা ক্রমে মারকে দমন করিলেন। মার পলায়ন করিল।

যীশুর জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকিয়া তপস্যা করিলেন। তৎপর তিনি যখন ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন সয়তান—"দিয়াবল" আসিয়া তাঁহাকে কহিল:—"হে যীশুখ্রীষ্ট, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই প্রস্তরগুলিকে রুটি করিয়া ভোজন কর না কেন?" যীশু বলিলেন, "মানুষ কেবল রুটি খাইয়া বাঁচে না, পরমেশ্বরের মুখামৃত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে।" তখন সয়তান তাঁহাকে

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র-রচিত বুদ্ধদেব হইতে গৃহীত

পুণ্য নগরে লইয়া গিয়া মন্দিরের উচ্চ চূড়ার উপরে দণ্ডায়মান করাইল এবং কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান হইতে নীচে পড় দেখি?" যীশু বলিলেন, "প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা করিতে নাই।" তখন সয়তান তাঁহাকে এক পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া জগতের সমুদয় ধন সম্পদ দেখাইয়া কহিল,—"দেখ, তুমি যদি ঈশ্বরের ভজনা না করিয়া আমার ভজনা কর, তবে এই সমুদয় ঐশ্বর্য্য তোমাকে অর্পণ করিব।" তখন যীশু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"সয়তান, তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।" ‡ সয়তান পরাভূত হইল। যীশু সিদ্ধি-লাভ করিলেন।

ভারতীয় পৌরাণিক কবি ললিত দেবভাষা সংস্কৃতে শিবের ধ্যান-ভঙ্গ ও কন্দর্প বিনাশ উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের অনুকরণেই শিব-মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। যোগাসন-প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ এবং ধ্যান-মগ্ন শিব একই জাতীয় উপাসক। বুদ্ধের নিকটে সংসার-বাসনা মাররূপে উপনীত হইয়াছিল, শিবের নিকট কামনারূপী পুরুষ—কন্দর্প আবির্ভূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব মারকে পরাভূত করিয়াছিলেন, শিব কন্দর্পকে কেবল পরাভূত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, একবারে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। শিব যদি পার্ব্বতীর পরিণয় কালে কন্দর্পকে পুনরুজ্জীবিত না করিতেন, তাহা হইলে, সমগ্র মানব-মণ্ডলী চিরকাল শিবের শিষ্য হইয়া থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিব তাহা করেন নাই। বুদ্ধ মারকে নিহত করিবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি উহাকে স্বয়ং পরাজিত করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে পরাজয়ের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন।*

আর্য্য ঋষির বাসনা-দমনের শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল—বুদ্ধ জীবনে এবং ইস্রায়েল জাতির প্রলোভন দমনের চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, যীশু জীবনে। বুদ্ধ এবং যীশু ধর্ম্ম-জগতের নরনারীকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে, মানব যতই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে, বাসনা ততই আপনার পথে লইয়া যাইবার জন্য বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। পরিশেষে অতি প্রবল আয়োজনে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হয় এবং যুদ্ধে পরাভূত হইয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করে।

প্রত্যেক জীবনেই মার—সয়তান—কন্দর্প—বাসনা অথবা পাপ নিয়ত আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী। এই শত্রুকে দমন করিবার জন্যই ধর্ম্ম-সাধনা। মার নানা বেশ ধারণ করিয়া মানব-অন্তরে প্রকাশিত হয়। সাধক অনেক সময়ই ইহার ছদ্মবেশে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। মানুষ ক্রোধকে যখন তেজ-নামে অভিহিত করে, হিংসাকে উন্নতির কারণ বলিয়া অবধারণ করে, ভোগকে শিল্প বাণিজ্যের জনক বলিয়া মনে করে, তখনই সে মার কর্ত্তৃক আত্ম-প্রতারিত হয়। পাপকে পাপ বলিয়া চিনিতে পারিলে তাহা দমন করা সহজ; কিন্তু পাপকে পুণ্য বলিয়া দর্শন করিলে তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা অতীব কঠিন। আধ্যাত্মিক জীবনের এবম্প্রকার অবস্থা রামায়ণকার একটী উপাখ্যানে উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম-পক্ষ জানিতে পারিলেন যে, মহীরাবণ

‡ মথী-লিখিত সুসমাচার হইতে গৃহীত।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বুদ্ধদেবের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

নামক মায়াবী রাক্ষস মায়াবলে রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিবে। তাহার এমনি মায়াশক্তি আছে যে, সে শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকেও মোহাভিভূত করিতে সমর্থ। সুতরাং বিভীষণের নেতৃত্বে যোদ্ধৃবৃন্দ এক ব্যূহ রচনা করিয়া রাম-লক্ষ্মণ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিভীষণ ব্যূহের চারিটী দ্বারে সৈন্য ও দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে, কোন ব্যক্তিকেই যেন ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। রজনী সমাগতা হইল। মহীরাবণ নানা বেশ ধারণ করিয়া ব্যূহ-দ্বারে উপনীত হইতে লাগিল, দ্বাররক্ষক দেখিবামাত্র ছদ্মবেশী শত্রু-জ্ঞানে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। মহীরাবণ প্রবেশ-অসুবিধা দেখিয়া অবশেষে বিভীষণের রূপ ধারণ করিয়া হনুমান-রক্ষিত-দ্বারে উপনীত হইল। হনুমান মিত্র বিভীষণকে দর্শন করিয়া নিঃসন্দেহ মনে ব্যূহ-প্রবেশের অধিকার প্রদান করিলেন। মায়াবী রাক্ষস ব্যূহে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করিল এবং তাঁহাদিগকে স্কন্ধে লইয়া অজ্ঞাতসারে পাতালে প্রবেশ করিল। পরিশেষে হনুমান প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মানবের হৃদয়ে পাপ যখন পাপ-মূর্ত্তিতে—সয়তান মানব মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তখন "দূর হও" বলা সহজ, কিন্তু সে যখন পারিবারিক কর্ত্তব্য" "সামাজিক কর্ত্তব্য," "আত্মরক্ষা" "তেজস্বিতা" প্রভৃতি বিবিধরূপে—উন্নতি সাধনের উপায়রূপে—অতি মিষ্টভাবে—পরমাত্মীয় রূপে উপনীত হয়, তখন তাহাকে কে দমন করিতে পারে? এরূপ কথিত আছে যে, পুণ্যশ্লোক মার্টিন লুথার একদিন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশে কৃষ্ণ মেঘের উদয় হইল, তিনি চমকিত হইলেন। প্রলোভনকে প্রলোভন রূপে চিনিতে পারিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, যেন সয়তান তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে সজীব ভাবে উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন—"Go hence Satan" দূর হও সয়তান। ধন্য মার্টিন লুথার। তিনি প্রলোভনকে—বাসনাকে চিনিতে পারিয়া "দূর হও" বলিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-জীবনের উষা-কালে দুইটী সাধনা আরম্ভ হইয়া থাকে, প্রথম কু-বাসনাকে কু-বাসনা বলিয়া চেনা, দ্বিতীয়, তাহাকে "দূর হও বলিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। এস্থলে পুরুষকার এবং ব্রহ্ম-কৃপার অপূর্ব্ব সম্মিলন। মানব ব্রহ্ম-কৃপাতেই পাপকে পাপ বলিয়া চিনিতে সমর্থ হয় এবং ব্রহ্মকৃপা-বলেই বাসনা-দমন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে সমর্থ হয়।

অহঙ্কার সর্ব্বনাশের মূল। বিনীত, আত্ম-চিন্তাপরায়ণ সাধকই প্রলোভনকে প্রলোভন রূপে চিনিতে সমর্থ হইয়া তাহা দমনে প্রবৃত্ত হয়। এজন্যই জগতের ভক্তগণ বলিয়াছেন, সাধন-পথে বিনয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সবল, শান্ত এবং বিনীত ব্যক্তিই শোক দুঃখভোগ এবং সুখের মধ্যে পাপকে উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে বলিতে পারে—"তুমি দূর হও।" যাঁহারা ভক্ত-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাসনা তাড়াইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারা যখন দেখিতে পান যে, লোকের ধনৈশ্বর্য্য—বিলাসিতা দর্শনে প্রাণে ভোগের বাসনা বলবতী হইতেছে, তখন বলেন—"মার, তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিতে আসিয়াছ? দূর হও তুমি।" চারিদিকে দুর্ভিক্ষ-

গ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট নর-নারীকে দর্শন করিয়াও স্বীয় অন্নগ্রাস মুখে উঠিতেছে, এ অবস্থায় সাধক বলেন,—"মাব, তুমি আমার হৃদয়ে আসন পাতিয়াছ? দূর হও তুমি।" আবার যখন সাধক দেখিতে পান যে, শোকার্ত্ত বিপদাপন্ন নর-নারীর সজল নয়ন দর্শন করিয়াও তাঁহার প্রাণ বর্ষিত হইতেছে না, তখন বলিয়া উঠেন,—"মাব, তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি আমার হৃদয় হইতে দূর হও।" যখন সাধক দেখিতে পান, প্রভাতে সূর্য্য উঠিয়াছে, বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, ফুলে ফুলে মধুকর ছুটিয়াছে, মৃদুল বাতাস বহিতেছে, প্রকৃতি হাস্যময়ী, শোভাময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী এবং আনন্দময়ী কিন্তু এই অনুকূল অবস্থাতেও চিত্ত মধ্যে ভগবানের নামামৃত ধারা প্রবাহিত হইতেছে না, তখন সাধক বলিয়া উঠেন, "এমন সুন্দর সুখকর সময়ে হে মাব, তুমি আসিয়া উপস্থিত হইলে? আমি নিখিল বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে আমার শিবসুন্দরের পরম শোভা দর্শন করিতে পাইলাম না। দূর হও মাব।" আবার যখন তিনি ধ্যানের আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতে পান যে, মন বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, বাসনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, পরমেশ্বরের চরণে স্থির হইয়া বসিতেছে না, তখন তিনি বলিয়া উঠেন, "হে মাব, তুমি সরিয়া যাও, আমি প্রভুর পূজা করিব।" এইরূপে সাধক সর্ব্ব অবস্থা হইতে মাবকে বিদায় প্রদান করিয়া শান্ত সমাহিত-চিত্তে ভগবানে প্রীতি অর্পণ ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভোগ-বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেই প্রাণে ভক্তি-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হয়।

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

মেঘনাদ-বধ।

এ কাব্যের কবি যে দেব-বিশ্বাসী নহেন, ইহা তাঁহার মাইকেল নামেই সূচিত। শুধু আখ্যানের খাতিরে তিনি দেবতাদিগকে তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার হৃদয় বা মনের মধ্যে তাঁহাদের জন্য কোন স্থান নাই। তাঁহাদের প্রতি মনে কোন বিশ্বাস নাই, হৃদয়ে কোন ভক্তি নাই। কিন্তু বৃত্রসংহারের কবি তাঁহার দেবতাগুলি সম্বন্ধে যতটা বৈজ্ঞানিকতা বা আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিয়াছেন, মাইকেল সেরূপ বড় একটা করেন নাই। তাঁহার শিব ও শিবানী অনাদি-কারণের গুণ বিশেষের ব্যাখ্যার মত নহে। গ্রীসীয় জুপিটার ও জুনোর সহিত যদিও তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী বলা উচিত, মাইকেলের শিব ও শিবানীর বড়ই সাদৃশ্য। কিন্তু জুপিটার ও জুনো স্ব স্ব উপাসকের জন্য যেরূপ পরস্পরে ঝগড়া করেন, কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, শিব ও শিবানী তাঁহাদের ন্যায় স্বকীয় উপাসকের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইলেও, সেরূপ ধরণের নহেন। ইঁহারা এ সম্বন্ধে কিন্তু ভারতীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত। ভারতবর্ষে স্ত্রীর নিকট যেরূপ সম্মানার্হ ও পূজনীয়, শিবানীর নিকট শিব ঠিক তদ্রূপ। সাম্যের দোহাই দিয়া শিবানী কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন না। অনুনয় বিনয় নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, একটু একটু মৃদু অভিমান, এই সকলের দ্বারা শিবানী নিজের কাজ হাঁসিল

করিয়া লয়েন। শিব, শিবানীর মনস্তুষ্টির জন্য, যথাসাধ্য, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

কবির স্বর্গের ধারণাটা বা বর্ণনাটা বড় একঘেয়ে রকমের মনে হয়। যতবার কবিকে স্বর্গে যাইতে হইয়াছে, তিনি স্বর্গরাজ বা স্বর্গরাণীকে কেবলই অপ্সরাদিগকে লইয়া নাচ গান করিতেই দেখিয়াছেন। অনেকে বলিবেন, স্বর্গে ইহা ছাড়া আবার হইবে কি? মানিলাম, নাচ ও গান খুব ভাল জিনিস, কিন্তু অহরহ ইহাতে মগ্ন না থ কিয়া আমরা যদি রাজসভাতে স্বর্গরাজকে ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর ব্যাপারে কখন ব্যাপৃত দেখি, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। ভারতীয় রাজসভাতে নৃত্য গীত হইত বটে, কিন্তু সেখানে শাস্ত্রালাপ, কাব্যালাপ কিম্বা রাষ্ট্রীয় কথাবার্ত্তাও চলিত। স্বর্গের সঙ্গে, অন্ততঃ একঘেয়ের ঘুচাইবার জন্যও এরূপ ভাবটা থাকিলে মন্দ কি? যখনই স্বর্গের বর্ণনা, তখনই নাচিছে অপ্সরা, গাইছে গায়ক বলিয়া ধুয়া ধরিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

এই স্বর্গের দেবতারা সকলে ততটা না হউন, অন্তত দুই একটী যেন কিছু পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। কবি হোমারাদির ভক্ত বলিয়া, হিন্দু দেবদেবীর চিত্রেও একটু গ্রীসীয় প্রভাবের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিব ও শিবানী খানিকটা জুপিটার ও জুনোর স্থান অধিকার করিয়াছেন। পবন দেবও স্বর্গরাজের তার-বিভাগের একজন পিয়ন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বর্গাধিপতির নিয়মানুসারে তিনি উপাসক উপাসিকাদিগের প্রার্থনা কখন দেবদেব মহাদেবের ও মহাদেবীর চরণে উপস্থিত করিতেছেন, কখন বা তাহা উড়াইয়া অন্যত্র চালিত করিতেছেন। রামচন্দ্র যখন বিপুদমনার্থী হইয়া শঙ্করীর পূজা করিলেন, তাঁহার প্রার্থনা পবন-দেব দ্রুতবেগে কৈলাসধামে পৌছাইয়া দিলেন। আবার যখন প্রমীলা যুদ্ধ-গমনোদ্যত স্বামীর মঙ্গলার্থ স্তুতি করিলেন, পবনদেব তাহা নিজ পক্ষের হানিকর ভাবিয়া মধ্যপথে প্রবল ও চঞ্চল বায়ু-তরঙ্গের আঘাতে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হিন্দুর কোন কাব্যে বায়ু-দূত কথাটা থাকিলেও, হিন্দু পুরাণকারগণ পবন-দেবের উপর *এরূপ ভাবে এমন কোন কার্য্যের ভার চাপা*-ইয়াছেন কি? তিনি বায়ুর দেবতা, কখন প্রলয়ের ঝড়রূপে বিশ্বধ্বংসকারী, কখন মলয় রূপে বসন্তের বন্ধু। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু পবনদেবের পিয়নগিরির কথা ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

ঐন্দিলা যেরূপ বৃত্রসংহারের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহানর্থরূপা উপদেবীর মত সর্ব্বত্র বিরাজমান, মাইকেল মন্দোদরীকে তাঁহার কাব্যে সেরূপ কোন প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার কাব্যাকাশে মন্দোদরী পূর্ণচন্দ্রও নহে, কিম্বা করাল রাহুও নহে, একটী ক্ষুদ্র তারকার মত তিনি কেবল জ্বল্ জ্বল্ করিতেছেন। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা জ্যোতির কণা, ইহাতে কালিমার লেশ মাত্র নাই। মন্দোদরী পুত্রগত-প্রাণা জননী, পুত্রের মঙ্গলার্থ তিনি দেহ-পাত করিতেও প্রস্তুত। তিনি কোমল-হৃদয়া, স্নেহময়ী শ্বশ্রূ, বধূ প্রমীলার প্রতি তাঁহার আদর ও যত্ন সমধিক। তিনি বিনয়-নম্রা পত্নী, মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ যখন যুদ্ধ সজ্জায় সাজিতেছেন, সেই সময় মন্দোদরী একেবারে পাগলিনীর মত স্বামী-সকাশে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাবণের সবিলাপ অনুরোধে তিনি দ্বিরুক্তি

না করিয়া,সখিগণের সহিত অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বীরবাহু-মাতা চিত্রাঙ্গদার ন্যায় ও রক্ষোরাজের অপবাদেই যে রক্ষঃ-কুল বিনষ্ট হইতেছে, এরূপ একটু মৃদু ভৎর্সনাও স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিলেন না। এই প্রকার কোমলতা ভিন্ন মন্দোদরীর আর আমরা অন্য কোন গুণের পরিচয় কাব্যে পাইলাম না। এ কাব্যের শ্বশ্রূ যেন বৃত্র-সংহারের বধূ।

আর ইহার বধূটী যেন উহার শ্বশ্রূ। কিন্তু শ্বশ্রূটী সেখানে দেখা দিয়াছে করাল বাহুরূপে, আর বধূটী এখানে মহা গৌরবময় পূর্ণচন্দ্র। সত্যই প্রমীলার অপূর্ব্ব জ্যোতিতেই এ কাব্য চির জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা একদিকে যেমন শারদ-লতিকা, অপর দিকে তেমনই লৌহের ন্যায় দৃঢ়। একদিকে তিনি বিরহের একটু জোর বাতাসেই নুইয়া পড়েন, অপর দিকে নিজের সঙ্কল্প-সাধনের নিমিত্ত, লৌহস্তম্ভের ন্যায় অচল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতে পারেন। তিনি বক্ষে যেমন ফুলের মালা দোলান, তেমনি কঠিন কবচও আঁটিতে পারেন। তিনি যে হাতে মালা গাঁথেন, সেই হাতে ত্রিশূলও ধরিতে পারেন। তিনি একদিকে পতিপ্রেম-বিভোরা বালিকা, অপর দিকে মহাতেজস্বিনী বীর-রমণী। কবি বড়ই মহিমাময়ী প্রতিমা গড়িয়াছেন। এই মহিমা-ময়ীকে দেখিয়া রামচন্দ্র যে বিস্মিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৃত্রসংহার পড়িলে মসীময়ী ঐন্দিলা যেমন আমা-দের চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, মেঘনাধ-বধ শেষ করিলে এই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রমীলা-মূর্ত্তি আমাদের নয়নে ও মনে জাগিতে থাকে। চিতার জ্বলন্ত আলোকে তদধিক জ্বলন্ত, এই পুণ্য-প্রতিমা আমরা দেখিতে পাই।

এই প্রতিমার পার্শ্বেও আমরা যাঁহাকে দেখি, তিনিও এই প্রতিমার পার্শ্বে থাকিবার যোগ্য পাত্র বটেন। মেঘনাদ যথার্থ মহা-বীর, এই বীর রমণীর যোগ্য স্বামী। যুদ্ধের বিষাণ শুনিলে তিনি আর প্রেম-সঙ্গীতে মুগ্ধ থাকেন না। চন্দনের লেপ মুছিয়া, কুসু-মের মালা ছিঁড়িয়া, তিনি মদমত্ত কুঞ্জের ন্যায় নিকুঞ্জ-ভবন হইতে বাহির হইয়া পড়েন। দাম্ভিক বীর হইলেও রুদ্রপীড়ের ন্যায় মেঘনাদও পত্নীর প্রতি প্রেমময় ও জনক জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবান। নিকুম্ভিলা যজ্ঞা-গারে অস্ত্রহীন বীরের উপর লক্ষ্মণের আক্র-মণ, আমাদের মনে মেঘনাদের প্রতি সহানু-ভূতি ও লক্ষ্মণের উপর বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তোলে।

কিন্তু যখন আলুলায়িত-কেশা, ধূলি-ধূসর-বেশা অশোক-কাননের সীতা-চিত্র আমাদের মনে আসে, তখনই এই সহানুভূতি ও এই বিতৃষ্ণা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়া যায়। মেঘনাদ নিজে এক্ষেত্রে অত্যাচারী না হইলেও পিতার অত্যাচারের সহায়তা-কারী ত বটেন। বিভীষণের মত অপর পক্ষ অবলম্বন না করুন, সদিচ্ছা থাকিলে পিতার দুষ্কার্য্যের সহিত কোন প্রকার যোগ না রাখিতে পারিতেন। ইহাও যদি পিতৃদ্রোহিতা বলিয়া বোধ হয়, অন্ততঃ প্রতিবাদ তো করা তাঁহার একান্ত উচিত ছিল। তাই চিরদুঃখিনী সীতার কথা ভাবিয়া আমাদের মেঘনাদের প্রতি সহানুভূতি নষ্ট হইয়া যায়। যাহাই হউক, লক্ষ্মণের বীর-ত্বের উপর এই কলঙ্কের দাগ চিরদিন দাগের মতই থাকিয়া যাইবে, সহস্র প্রকার ওজর আপত্তি দ্বারা তাহা কখন একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় না।

রক্ষোবংশের কয়েকটী চরিত্র চিত্র আমরা দেখিলাম। কিন্তু রক্ষোবংশ বলিতে আমরা পুরাণে যেরূপ বুঝি, মাইকেল সেরূপ ভাবে এ বংশকে তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করেন নাই! তিনি রক্ষঃ কি বানর, উভয়কেই মনুষ্যের পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন। এমন কি, মানুষের আকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের দিয়াছেন। তিনি রক্ষোবংশের কাহাকেই বড় একটা কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিতে চিত্রিত করেন নাই। সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত চেড়ীদলের ভীষণ আকৃতি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা অতিশয় নীচ জাতীয়া। অত্যন্ত নীচ জাতীয়া মানুষকেও লোকে কতক ঐরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার রাবণ, মেঘনাথ, বিভীষণ, মন্দোদরী বা সরমা —প্রমীলার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তিনি তো গন্ধর্ব্বদুহিতা সৌন্দর্য্যের খনি—ইহাদের কাহাকেও কি আমরা রাক্ষস বলিয়া—রাক্ষস বলিতে যাহা বুঝি—মনে করিতে পারি? রাবণকে কবি দশানন বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল নামেই,কখন তাঁহাকে দশটী আনন যুক্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন, এরূপ তো মনে হয় না। তাঁহার বানর গুলিও শাখামৃগ নয়। তাহাদের লোমাবৃত তনু বা সুদীর্ঘ পুচ্ছের কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। তাহাদিগকে বরঞ্চ একবার 'দাক্ষিণাত্য' বলিয়াছেন। মোট কথা এ কালে রাম রাবণ ও সুগ্রীব এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দলের লোক সকলই মানুষ। রাবণ দশমুখো রাক্ষস নয়, সুগ্রীব সমুচ্চ বানর নয়, রামও কিছুমাত্র বিষ্ণুর অবতার নয়।

রামের চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে অনেকেই মাইকেলকে দোষী করিয়া থাকেন। ইহা যে নিতান্ত অন্যায় দোষারোপ, তাহা বলা যায় না। কারণ তিনি রামচন্দ্রের একটা দিকই অত্যন্ত বেশী রকম দেখাইয়াছেন, অন্যদিক একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও চলে। রাম শুধু একজন কোমলহৃদয় স্নেহের মানব নহেন, তিনি মহান প্রতাপান্বিত তেজস্বী বীরপুরুষ। অবশ্য মাইকেল যে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার রূপে অবতারিত করেন নাই,সে জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া খাটে না, কারণ ভিন্ন লোকের ভিন্ন বিশ্বাস,কিন্তু তিনি রামের তেজস্বিতা ও বীরত্ব কিছু তো দেখাইতে পারিতেন? শুধু তাঁহাকে এত নারীভাবাপন্ন করিলেন কেন? তবে কবির দিক দিয়া একটু কথাও ইহার মধ্যে আছে। কাব্যের নাম ও বিষয় হইল "মেঘনাদবধ", ইহার জন্য যাহা কিছু করিবার, তাহা লক্ষ্মণের উপরেই পড়িয়াছে। সুতরাং সৌমিত্রী কেশরীর কেশরীত্বই—একটু জম্বুকত্ব থাকিলেও কেশরীত্ব অনেক আছে—আমাদের নয়নের সম্মুখে বেশী ধরা হইয়াছে। রামচন্দ্র নিজে কিছু করিতে পারিতেছেন না—করিতে গেলে পুরাণ উল্টাইয়া যায়। ছোট ভাইটীর উপর তাঁহাকে এই অত্যন্ত দুরূহ কার্য্যের ভার দিতে হইয়াছে। যাহাকে তাঁহার জননী হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকেই সেই দুর্দ্ধর্ষ রাসব-বিজয়ী রিপুর দমনে পাঠাইতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে রামচন্দ্র যে একটু সুমিত্রার স্থান অধিকার করিবেন, ইহাও স্বাভাবিক। তবে কিনা এই অধিকারের—এই নারী-সুলভ কোমলতার মাত্রা বীরপুরুষের পক্ষে কিছু বেশী রকম হইয়া পড়িয়াছে। এই কোমলতার সঙ্গে কবি সংক্ষেপে যদি অন্য দিকটাও দেখাইতেন, তবে ইহা মানাইয়া যাইত।

এই কাব্যে অনেক পাশ্চাত্য কবির মত মাইকেলের কতকগুলি চিরস্থায়ী বা অবিভাজ্য বিশেষণ আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই বিশেষণ-যুক্ত, তাহার নাম করিতে হইলে সেই বিশেষণ সমেত করিতে হইবে। যথা—কুম্ভকর্ণের নমোল্লেখের সময় "শূলী শম্ভুনিভ" বিভীষণের নামের সহিত 'বিভীষণ রণে' বসাইতেই হইবে। কুম্ভকর্ণকে আমরা এ কাব্যে দেখি নাই, তিনি পরলোকগত। সুতরাং কুম্ভকর্ণ শূলী-শম্ভুনিভ" ছিলেন কিনা, ইহা ভাবিয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কিন্তু বিভীষণকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিলাম—বড়ই ক্ষোভের বিষয়, একটুও তাঁহাকে রণে বিভীষণ বলিয়া মনে হইল না। বিভীষণ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি রণ যে কখন করিলেন, তাহা বড় একটা অনুভূত হয় না। তিনি অস্ত্রহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে দৌবারিক-বেশে সশস্ত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাতে অবশ্য তাঁহার বিভীষণত্ব কিছুই নাই। নিজে রীতিমত হাতিয়ার আঁটিয়া, যাহার হাতে কিছুমাত্র হাতিয়ার নাই, এরূপ লোকের সম্মুখে বীরত্ব দেখাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বিভীষণ হইবার প্রয়োজন হয় না।

দৈত্য বড়, কি রাক্ষস বড়, তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে নাম শুনিয়া রাক্ষসকে যেন বেশী ভয়ঙ্কর ও পশুভাবাপন্ন মনে হয়। কিন্তু মাইকেলের রাক্ষসগণ হেমচন্দ্রের দৈত্যগুলি অপেক্ষা যে সুসভ্য ও শিক্ষিত, ইহা সম্ভবতঃ অনেক পাঠকই অনুভব করিবেন। বৃত্র অপেক্ষা রাবণ সুসভ্য, ঐন্দ্রিলা অপেক্ষা মন্দোদরী সুসভ্যা। মেঘনাদ ও প্রমীলাকে যেন রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা অপেক্ষা সুশিক্ষিত দেখায়। ইহাদের কথা-বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, সবই যেন একটু শিক্ষিত রকমের। এইরূপ হইবার কারণ পূর্ব্বে কতক বলিয়াছি। মাইকেল যতটা রাক্ষসের রাক্ষসত্ব ঘুচাইয়া মানবত্ব—শুধু মানবত্বই বা কেন বলি, মানবের শিক্ষা ও সভ্যতা পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন, হেমচন্দ্র দৈত্য সম্বন্ধে অতটা করেন নাই। তিনি দৈত্যকে মনুষ্যরূপে আঁকেন নাই। বৃত্রের রাজসভায় প্রবেশ করিতে আমাদের যতটা ভয় হয়, রাবণের রাজসভায় যাইতে ততটা হয় না। বৃত্রের ত্রিনেত্র হইতে সর্ব্বদাই যেন অগ্নি বহির্গত হইতেছে, তাহার হাতে যেন ত্রিশূল সর্ব্বদাই নড়িতেছে, কিন্তু রাবণের বিংশতি চক্ষু আমাদের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে না। স্বাভাবিক দুইটী চক্ষুই তাহার দেখিতে পাই এবং তিনি সর্ব্বদা শক্তিশালী হইয়াও দেখা দেন না।

আর একটু কথাও এই সঙ্গে বলা চলে। দেবেন্দ্রাণী শচী অপেক্ষা মর্ত্ত্যবাসিনী সীতা উন্নত স্বভাবা তো বটেনই—একটু বেশী শিক্ষিতাও কি নহেন? সরমার নিকট সীতার বনবাস-কাহিনীর বর্ণনাটী বড়ই সুন্দর ও সুচিত্রিত। নৈমিষ-কাননের শচী অশোক-কাননের সীতার স্থান অধিকার করিলে, আমরা এমনটী কখনই শুনিতে পাইতাম না। এই বর্ণনার দর্পণে আমরা যেন সমস্ত সীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছি। করুণা, কোমলতা ও পবিত্রতা যেন ইহা হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বর্ণনা এমনি স্বাভাবিক ও এমনি প্রাঞ্জল যে, ইহার বর্ণিত বিষয়গুলি যেন আমাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মহানুভব জটায়ুকে আমরা কাব্যেতে না দেখিয়াও এই বর্ণনাতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া ভক্তি-বিনম্র মস্তকে প্রণাম করি। ধরণীদেবী আমাদের সম্মুখে না আসিলেও ইহার মধ্য হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই।

কিন্তু এই ধরণীদেবীর প্রসঙ্গে কবির একটু ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই বর্ণনাতে ধরণীদেবী রাবণের অত্যাচারের ভাবে অত্যন্ত নিপীড়িতা, ইহাই শুনিলাম। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ রাবণের হাত হইতে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র যখন সদলে রামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন ধরণীদেবী বিষ্ণুর নিকট অভিযোগ করিলেন কি? না, তিনি এত লোকের যুদ্ধের ভার সহিতে নারাজ। বিষ্ণুও গরুড়কে পাঠাইয়া দেবতাদের তেজ হরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে হইল কি? যাহার অত্যাচারের ভয়ে ধরণীদেবী একান্ত ভার-গ্রস্তা, তাহাকেই তো জয়ের মুকুট পরান হইল। সীতা ধরণীর কন্যা, নিজের কন্যারও উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইতেছে, ইহা কি একবার তিনি ভাবিলেন না? যেমন করিয়াই হউক, দুইটা দিক যেন কিছুতেই মিলান যায় না।

সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে কথা আছে, উপমায় কালিদাসই শ্রেষ্ঠ। এই উপমা বিষয়ে বাঙ্গলার কালিদাস কে? সম্ভবতঃ মাইকেলের নাম করিলে অসঙ্গত হয় না। কাব্যের কলেবরের তুলনায় বঙ্গভাষার কোন কবিই নিজের গ্রন্থে এত উপমার বর্ষণ করেন নাই। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং। প্রবাদটী সর্ব্বস্থলে না খাটুক, মাইকেলের উপমা-বাহুল্যে একটু খাটিয়াছে। বেশী টাকা কড়ি ঘাটিতে গেলে তাহার মধ্যে দুই একটা মেকি আসিয়া পড়ে। দুই একটা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কবির উপমার মেকি যেন যতটা থাকা সম্ভব, তদপেক্ষা সংখ্যাধিক বোধ হয়। অনেক সময় কাণে বড়ই বেসুরো লাগে, পাঠকের চিত্তে একটু বিরক্তি ও অবসাদের আভাস আসিয়া পড়ে। অনেক সময় উপমাগুলিকে নিতান্ত একঘেয়ে ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া যে খাঁটি সোণার অভাব আছে, তাহা নয়। অনেক উপমা অতি সঙ্গত, সুন্দর ও স্বাভাবিক। বৃত্রসংহারে এ সম্বন্ধে এতটা বাহুল্য না থাকুক, কিন্তু তাহাতেও খাঁটি জিনিষের অনাটন নাই।

শেষে শব্দ-সম্পদের কথাটারও একটু উল্লেখ প্রয়োজন। মাইকেল শুধু উপমায় নহে, শব্দ-বিভবে এ বঙ্গীয় কাব্যকারগণের প্রধান। এমন সুন্দর শব্দযোজনা বড় একটা অন্যত্র দেখা যায় না। এই কাব্যখানি যেন একটী কাটা ছাঁটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্যান। যে খানে যে বৃক্ষটী বসাইলে, লতাটী দুলাইলে, ফুলটী ফুটাইলে শোভা পায়, কবি তাহা যেন অতি যত্নে সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় বৃত্রসংহার যেন একটী স্বভাবের কানন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মাইকেলের শব্দৈশ্বর্য্য তো আছেই, তাহা ছাড়া তিনি আবার একটু সুবিধাও পাইয়াছেন। তাঁহার বাগান অন্যের তুলনায় অনেক ছোট। একটী ক্ষুদ্র স্থানকে যতটা পরিষ্কৃত রাখা যায়, সে স্থানটীর আয়তন বাড়িলে একটু অসুবিধা হয় না কি? যাহাই হউক, মাইকেল যে একজন দক্ষ শিল্পী, সে বিষয় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এই শিল্পনৈপুণ্যের সাহায্যে তিনি ছোট ভাবটীকেও বড় আকার দিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর শুধু কবি বলিয়াই নহে। যৌগিক ক্রিয়াপদ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টারূপেও মাইকেলের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

আমাদের জাতীয় উন্নতি কিসে হইবে?

আমাদেব জাতীয় উন্নতি কিসে হইবে? এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিব। অনেক গুলি কথা বলা আবশ্যক। সুতবাং প্রত্যেক কথাটী, সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

আমি এ বিষযে প্রথম যাহা বলিব, তাহা এই যে, আমাদেব প্রথমে একটী জাতি হওযা আবশ্যক। এখন আমবা যাহা আছি, তাহাকে একটী জাতি বলা যায না। জাতীয়ত্বেব মূল যাহা, তাহা আমাদের নাই। সে মূল, জাতীয় একতা। জাতীয় একতাই যদি না থাকিল, তবে একটী জাতি হইবে কি প্রকাবে? কেহ বলিবেন, আমবা একটী ভাবতবর্ষীয় জাতি না হইতে পাবি, কিন্তু আমবা যে বাঙ্গালী-জাতি, ইহাতে তো সংশয় নাই?

আমি সে কথা স্বীকাব কবি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভাবতবর্ষকে ছাডিযা কেবল বঙ্গদেশবাসিগণকে লইযা একটী জাতি সংগঠন কি কখন সম্ভব হয? ভাবতবর্ষেব অন্যান্য অংশেব সহিত আমাদেব যে সম্বন্ধ, তাহাতে তাঁহাদিগকে ছাড়িযা কেবল বঙ্গদেশবাসীদিগকে লইযা একটী জাতি বলা কখনই সঙ্গত নহে। এখন সমগ্র ভাবত এক রাজার অধীন। সুতবাং সমগ্র ভাবত এক সাধারণ সূত্রে বদ্ধ। পবস্পবেব সহিত পবস্পবেব অতি নিকট সম্বন্ধ। এক প্রদেশে যাহা হয়, তাহাব প্রভাব অতি সহজে অন্য প্রদেশে গমন করে। সুতরাং পরস্পব বিচ্যুত হইয়া কার্য্য করা কখনই সম্ভব নহে।

যদি কখন আমবা একজাতি হই, তবে, সমগ্র ভারত মিলিয়া একজাতি হইব। সেইদিকে, এ জাতিব গতি। এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদেব মধ্যে জাতীয় ভাব একেবাবেই ছিল না। বাঙ্গালী, একটা জাতি ছিল বটে, কিন্তু তাহাব মধ্যে আবার হিন্দু ও মুসলমান। এখনও তাহাই। যখন এক বাঙ্গালী জাতি বীতিমত একটী জাতি হইতে পাবে না, তখন সমগ্র ভাবতবাসীকে একজাতি বলা কি কখন যুক্তি-সঙ্গত হয়?

কিন্তু আমি তাহাই বলিতেছি। জাতীয়তাব যে সকল লক্ষণ আছে, তাহা প্রযোগ কবিলে আমবা একটী জাতি হইতে পারি, এমন নয; তবে সেইদিকে গতি বলিয়া আমরা ধবিযা লইতেছি যে আমবা একজাতি। এমন দিন নিশ্চয আসিবে, যেদিন ভারতবর্ষবাসিগণ একজাতি হইবে।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা কবিতে পারেন যে, জাতীযতাব সাধাবণ লক্ষণগুলি কি? এস্থলে, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। প্রথম, এক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, এক ভাষা। তৃতীয়, আচাব-ব্যবহাবেব একত্ব। এই তিনটীই প্রধান। হিন্দু-বাঙ্গালীদের মধ্যে এই তিনটীর একত্ব অনেক পরিমাণে আছে। তাঁহাদের মধ্যেও এ সকল বিষয়ে প্রভেদ আছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ও পশ্চিম-বাঙ্গালায় আচাব-ব্যবহারের প্রভেদ আছে। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাবে। কিন্তু তাহাব প্রয়োজন দেখিতেছি না।

এখন আমার যাহা বিষয়, সে বিষয়ে

আসি। জাতীয়-উন্নতি কিসে হয় ? একটী কথা বলিলাম যে জাতীয়তা বৃদ্ধি হওয়া চাই। সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তা বৃদ্ধি হওয়া চাই। কিসে ভারতবাসী বিভিন্ন-প্রদেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তা বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা এখন হইতে হওয়া আবশ্যক।

প্রথম ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কি ? নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ক্রমে সমগ্র ভারত-বাসীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। নিশ্চয়ই অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু একদিন না একদিন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকল ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইবে, ইহা অনেক কারণে বুঝা যায়। আমরা তাহা এক একটী করিয়া বলিতেছি।

প্রথম, এখন দেখা যাইতেছে যে, ভার-তের বিভিন্ন-প্রদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যাহা মূল সত্য, তাহাতেই ভারতবাসী বিভিন্ন-প্রদেশবাসী শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস। বিভিন্ন-প্রদেশবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপে একটী যোগ হইতেছে। ইহা নিশ্চয় যে, দেশের শিক্ষিত লোকেরাই দেশের নেতা। সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস অন্য-রূপ হইলেও, দেশের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের যে বিশ্বাস, সেইদিকেই সাধারণের মনের গতি, ক্রমশঃ হইবেই হইবে। তারপর, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলিত হইলে, অতি সহজেই ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদের বিশ্বাসের বিষয় হইবে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, সর্ব্ব-সাধারণ লোক স্বাধীন ভাবে পরমেশ্বরকে ধরিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে একজন বা দুইজন, যাহা হউক, গুরু আবশ্যক। গুরু ব্যতীত পরমেশ্বরকে ধারণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। আমি এ কথা স্বীকার করি। মহম্মদ না থাকিলে, মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ কখনই রক্ষা পাইত না। শিখ-ধর্ম্মেও একেশ্বরবাদ আছে, সত্য, কিন্তু গুরু না থাকিলে উহা রক্ষা পাইত কি না, সন্দেহ। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে পারে। কিন্তু গুরু আবশ্যক।

যাহা হউক, ভবিষ্যতে যে এ দেশের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক জাতি হইতে হইলে, এক ভাষা আবশ্যক। সে ভাষা কি হইবে ? কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজীই সেই ভাষা। আমি তাহা মনে করি না। সকল প্রদেশের শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাই বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, সকল প্রদেশের শিক্ষিত লোক ইংরাজী ভাষায় কথা কন। এখন ইংরাজের রাজ্য, সুতরাং ইংরেজী ভাষা যে শিক্ষিত লোকের মধ্যে চলিত হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে হিন্দি ভাষা যেমন উপযোগী, এমন আর কিছুই নহে। মাদ্রাজ প্রদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র হিন্দু-ভাষা প্রচলিত। উহা এক প্রকার বলিতে গেলে, ভারতের সাধারণ ভাষা। ইয়ো-রোপের পক্ষে যেমন ফরাসী ভাষা, ভারতের পক্ষে সেইরূপ হিন্দি। এ দেশের পক্ষে হিন্দি সাধারণ ভাষা হওয়া যেমন সম্ভব, এমন আর কোন ভাষা নহে।

এখন দেখা গেল যে, এক জাতি হইতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মই এ জাতির ধর্ম্ম হইবে, এবং হিন্দি এ জাতির ভাষা হইবে।

তারপর, ধর্ম্ম এক হইলে যে ক্রমে ক্রমে, আচার ব্যবহার এক হইবে, তাহাতে সংশয় কি? কালে সে ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটী জাতি সংগঠিত হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

এখন আর একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা বলি। জাতীয় একতা এবং জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে তাহা বিশেষ আবশ্যক। সে কথাটী এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর পরস্পর বিবাহ। এই বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত ভারতের সঙ্গল নাই; এবং ইহা যে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যত ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইবে, ততই বিভিন্ন প্রদেশবাসীর বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে থাকিবে। ইহাতেই ভারতবাসী ক্রমে এক জাতি হইবে।

সমগ্র ভারতবাসী এক জাতি না হইলে, এ জাতির কখনই মঙ্গল নাই; কিন্তু ইহা হওয়া অত্যন্ত সময়-সাপেক্ষ। সময়-সাপেক্ষ হইলেও, হইবেই হইবে। এখন এ দেশের হিতৈষীগণের এমন ভাবে চলা আবশ্যক, যাহাতে এই মহা উদ্দেশ্য সফল হয়। আমি এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব? এ বিষয়ে যে কয়টী প্রধান কথা, তাহা বলিলাম।

জনৈক পরলোকবাসী আত্মা
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চেন্নপট্টন। (৩)

দুই রাত্রির কয়েক যাম, নটকীর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি। মহীসুর হইতে আগত, তামিল নাট্যসমাজস্থ যবনিকা উত্তোলিত হইল। সম্মুখে পট ও নান্দি প্রভৃতি, পুণ্যপত্তনে দৃষ্ট বঙ্গমঞ্চের অনুরূপ। চণ্ডকৌশিক গীতাভিনয়, মোহময়ী নগরীয় পারসী ইন্দ্রসভার সুরে হইল। তাহাতে মূর্চ্ছনা নাই। সুব্বারাও আচারির (আচার্য্যের) অভিনয়-শালায়, চর্ম্মনির্ম্মিত বায়ুকোষ বাদ্যে, ফুৎকার দ্বারা আলাপন করিতে শুনিয়াছিলাম। ইহা অহিতুণ্ডিকের বিনলযুক্ত তিত্তিরির মত। যন্ত্রস্থ একটী নল কেবল স্বরযোগের জন্য ব্যবহৃত। 'বঙ্গে, ইউরোপীয় প্রণালীতে গঠিত বঙ্গালয়ের তুলনায় এগুলি নিকৃষ্ট। সৌন্দর্য্যানুরাগ বর্দ্ধিত করে, এমন কোন বস্তু নাই। সুতরাং চক্ষুর শিক্ষা হইল না। আমরা ভাষা বুঝি না, কর্ণের শিক্ষা কতদূর হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই। অধিকাংশ স্থলে, ব্যবসায়ের জন্য অভিনয় ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত হয়; কলা বিদ্যার সাধে নহে। অপর কলা, একটী ভাবের উপর কার্য্যকরী হয়। কিন্তু বঙ্গমঞ্চ আংশিকভাবে, তাবৎ অনুভূতির উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাহার প্রভাব নাই। দর্শক আপনাকে বিস্মৃত হইয়া অভিনেতার সহিত একপ্রাণ হইয়া যান। ইংলণ্ডে একজন নায়িক পাত্রীর অপমানকারীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নটবিদ্যাকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সহজ উপায় করা যাইতে পারে। এক সহরে বঙ্গালয়ের সংখ্যা তিনশত। সামান্য নগরে দুই বা তিন। দুঃস্থ বালক, মিষ্টান্ন ক্রয় না করিয়া, সেই "পেনি" দ্বারা অভিনয় দর্শন করে।

এখন, রজনী আছে। আমরা শয্যা-ত্যাগ করি নাই। পথে এক অস্ফুট ধ্বনি হইতেছে। উহা চিৎকার নহে। নারী-কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর, তাহাতে পৈশাচী, বোধগম্য হইবে না। কেবল শ্রুতির হিল্লোল পাইতেছি। সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বাহে, প্রত্যূষে মহিলাগণ বহির্দ্বারে আলিম্পন প্রদান করতঃ গোময়ের বর্ত্তুল স্থাপন করিয়া, তদুপরি কুষ্মাণ্ডের পুষ্প প্রোথিত করিবেন। তজ্জন্য, বিক্রেতা পণ্য খ্যাপন করিয়া যাইতেছে।

এখানে অমান্ত মাস হইয়া থাকে, সংক্রান্তি অনাবশ্যক নহে। চতুর্ব্বিধ কাল মানে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। চৈত্রে বৎসর আরম্ভ। সায়ন গণনায়,—ষষ্টি সংবৎসরে একচক্র পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক বৎসরের নাম স্বতন্ত্র। অধুনা, নন্দন নামে সংবৎসর চলিতেছে।

মদ্রাজে, একটী রাজকীয় বেধশালা আছে। ভারতের জ্যোতিষিগণ সমবেত হইয়া আগমন করতঃ দৃকসিদ্ধভাবে গণনা দ্বারা পঞ্জিকা-সংস্কার করিতে পারিবেন। গ্রহণ নির্ণয় বিশুদ্ধ করিতে, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নাবিক পঞ্জিকার আশ্রয় লইতে হইবে না। অকালে কেন ক্রিয়া করাইতেছেন? চন্দ্রশেখর সিংহের দৃকগণনায়, উৎকল পঞ্চাঙ্গ শোধিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা, সময়োপযোগিতা, পৌরাণিক ব্যক্তির জন্মোৎসব, জ্যোতিষিক কাল-নির্ণয় প্রভৃতি কারণে আমাদের ব্রত পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আরাধ্য দেবগণ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সকলি জ্যোতিষ্ক। বৈদিক মন্ত্রের জ্যোতিষিক রূপক, বৈদিক ব্রাহ্মণে পল্লবিত হইয়া, পুরাণে মানব চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তদনুসারে, দেবতার রূপ কল্পিত হইল। তাঁহাদের সন্তানাদি না হইবে কেন? ধ্রুব তারা রাজার পুত্র। আকাশের ছায়া-পথ, মর্ত্ত্যে গঙ্গা। রবির উত্তর মার্গ, দেবলোক। তাঁহার দক্ষিণ পথ, পিতৃলোক। ছায়াপথের অগস্ত্য নক্ষত্রকে বৈতরণী পারের নৌকা, পুনর্ব্বসুর ২টী তারাকে যম ও তাঁহার ভগিনী কাল-পুরুষ নক্ষত্র প্রজাপতি বা ব্রহ্মা; আর্দ্রা রুদ্র ও সূর্য্য বিষ্ণুরূপে বর্ণিত। খ্রীষ্ট জন্মের আট সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্যজাতি চির-শরৎ-বিরাজিত মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে, ষণ্মাস-ব্যাপী দিবারাত্রির অবসানে, কয়েক দিন ব্যাপী উষাকালে যে দেবতার স্তুতি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, আমরা প্রতিক্ষণে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। পঞ্জিকাকারগণ,এমন বস্তুর উদয়াস্ত নির্ণয়ের ভ্রম করিলে নিতান্ত পরিতাপ হয়।

অশ্বধাবন উপলক্ষে, পোক যাত্রা দর্শনেচ্ছু হইয়া চলিলাম। নগরোপকণ্ঠে ক্ষুদ্র পর্ব্বত সন্নিধানে গিণ্ডি অবস্থিত। এখানে মদ্রাস প্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রাম্য বাসস্থান। অনেকগুলি আলিবন্ধের পরে, আদের নদীর পশ্চিম ভাগে মারমেলঙ সেতু পার হইতে হইল। ধাবন স্থানের পরিধি, সার্দ্ধ এক-মাইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে, বিজয়নগর ও রামনাদের রাজা শ্রীগজপতি ভাস্কর উপস্থিত হইয়াছেন। বেগবান ঘটক পৃষ্ঠে, ধাবকের নাম ও সংখ্যালিখিত ফলক-আলম্বিত। সহস্র মুদ্রা পরিমিত ৪টী পারিতোষিকের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত জয় লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতার ন্যায়, অন্যে অনর্থক পণ করতঃ দ্যূত-দুর্নীতিতে ধনক্ষয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কাল উপস্থিত হইল। নগ্ন-পাদ-তাড়িত, দ্বিচক্রযান, ত্বরিত বহির্গত হইতে দেখিয়া, জনতা শিথিল হইয়াছে।

আরোহী স্বীয় মুণ্ডিত-শিরস্থ দীর্ঘ শিখাগুচ্ছ গোলটুপীর মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের "ঝট্‌কা" ঝটিতি চলিবার নহে। বলিবর্দ্দ তাড়নায় ভ্রুক্ষেপ করে না। ইহা শ্রেয়স্কর। চক্ষু, অবলোকন করিবার অবসর পাইবে। ক্রতগাম-চালকের পশ্চাৎ-দণ্ডায়মান ব্যক্তি, "অয়" ধ্বনি করিয়া, সতর্ক করিয়া গেল। কলিকাতার মত কর্কশভাবে "এই-ও" সম্বোধন অন্যত্র নাই। শকট-চালক বামা-গতি অনুসরণ করিবে, লোকসংঘ দক্ষিণ-বাহী হইতে সচেষ্ট। পুর-প্রবেশ করিলে, প্রাণবায়ু লঘুপরিমাণে মিলিবে; তথাপি সকলে শীঘ্র যাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। প্রশ্বাস দ্বারা, গুরুবায়ু অধিক বহির্গত করা হইতেছে। আসব-প্রিয়দিগের জন্য, নারিকেল-বিটপী ইতস্ততঃ রক্ষিত, দৃষ্ট হইল। মদ্যপ ব্রীটন-বাসী, মাদক-দ্রব্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। আমাদের ঋষিগণের মত, তাঁহারা প্রাচীন-কালে ধর্ম্মোৎসবে মাতাল হইতেন। দোষবোধে আমরা ইহা পরিত্যাগ করিয়াছি। নাগস্বকস্ পল্লিসরোবর অতিবিস্তৃত। তাহার পার্শ্বভেদ করিয়া, পুষ্পবিদ্যা-প্রদর্শক উদ্যানের সম্মুখীন হইলাম। অনতিদূরে কোয়েম তীরে সৈদাপেট কৃষি-বিদ্যালয় অবস্থিত। দেশে যে শস্য উৎপন্ন হয়, রাজা তদর্দ্ধ গ্রহণ করেন। অতএব ঔষধির উন্নতি-কল্পে রাজকর্ম্মচারী-গণের শিক্ষার জন্য আদর্শক-ক্ষেত্র প্রয়োজনীয়। কৃষক, কৃষিযন্ত্রের পরিবর্ত্তন করা অধর্ম্মবোধ করে। সার ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

প্রান্তবর্ত্তী নিদ্রিত স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে নগরের কোলাহলে প্রবিষ্ট হইলাম। আমাদের বাসস্থান সাউকারপেট নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা সরশিবালি রামস্বামী মুদোলিকে দেখি নাই। তাঁহার নাম, স্তম্ভদীপক ও ডালনালীর গাত্রে লিখিত আছে। বক্ষ্যমান পান্থনিবাসে, কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় ও নানা সৎকার্য্যে তাঁহার দান থাকিলেও, জনপদগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। পরশ্রীকাতরতা ইহার কারণ। রামস্বামী, আরবুথনট্ কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দী। ধনাত্যয় বশতঃ লক্ষ্মীর আরাধনায় বারত্রয় অকৃতকার্য্য হইয়া অধুনা বার্ষিক অযুত মুদ্রা লাভের বিষয়পতি হইয়াছেন। বাষ্পীয় শকটাশ্রমের সন্নিকটে লর্ড ওয়েন্‌লক ছত্র উদ্ঘাটিত করিলেন। গবর্ণর-পত্নী স্বহস্তে বৃক্ষরোপণ করিলেন। রাজা বলেন, প্রত্যহ দুইশত দরিদ্রকে আহার দিবার জন্যে, ২ বৎসরের মধ্যে, সম্রাজ্ঞীর ভাণ্ডারে অর্থ ন্যস্ত করিবেন। সম্প্রতি বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইল। উহার বৃদ্ধিদ্বারা, অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। ২ বৎসর পরে নগরশোভা সম্বর্দ্ধিনী সভা, ছাত্রের ভার পাইবেন। ১ম প্রকোষ্ঠ মুদেলী নায়ডু এবং পিল্লইদিগের জন্য, ২য় প্রকোষ্ঠ, ব্রাহ্মণ পাচকের জন্য। ৩য় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিমিত্ত। ৪র্থ মাড়য়ারি ও চেট্টিদের জন্য ব্যবহৃত হইবে। পূর্ব্বদিকের শেষভাগের ২টী প্রকোষ্ঠ মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের। সপ্তমটী স্বকীয় বা আপন উত্তরাধিকারিগণের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গালীতে, এরূপ কেহ করিতে পারেন নাই।

ভ্রমণাবসরে, দ্বিরাগমন-উৎসব উপলক্ষে দ্রব্যসম্ভার বাহিকে ঐ দেখা যাইতেছে। এই প্রথা হইতে, বাল্য বিবাহের দুষ্টফল কিয়দংশে নিবারিত হইয়া থাকে। এখানে ঢেঁকী নাই। উদূখলের সাহায্যে তৎকার্য্য সমাধা হইতেছে। বৈদিক কালে তজ্জন্য উদূখল একটী দেবতা ছিলেন। যাহা হইতে উপকৃত হইতে হয়, সেই পূজ্য। আমরা ঢেঁকিতে

"বামনি" বাঁধি। বাদিত্রধ্বনি কেন শ্রুত হইল, ভাবিতেছি। এমন কালে শববাহী আগত। বিচেতন ব্যক্তিব মুখাববণ উন্মুক্ত। নারীর অধরে তাম্বুল রাগ। ললাটে কুম-কুম্। জঙ্গম সম্প্রদায়ের লোক, অতএব প্রোথিত হইবে। প্রেতাহাবেব জন্য সমাধি-মধ্যে মৃৎপাত্রে খাদ্য প্রদত্ত হইতে পাবে।

পল্লবরম্ সেনানিবাসেব নিকট, পল্লববাজ-গণেব সমাধিক্ষেত্র দৃষ্ট হয। পুরুষ হইলে উপবিষ্ট ভাবে, নাবীব পক্ষে শায়িত অবস্থায প্রোথিত হইতে হয। মৃত্তিকাব উপব, নাতি উচ্চ পঞ্চপদীতে প্রস্তব-ফলক, আদিম গৃহ নির্ম্মাণেব পবিচয দিযাছে। কোন সময়, এই বাজবংশ, ওড্র হইতে পিনাকিনী নদীর মুখ পর্য্যন্ত আধিপত্য কবিতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, তাঁহাদেব দ্বাবা সিংহলে প্রেবিত হইযাছিল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও অপব ধর্ম্মিবা, পল্লববাজ্যে স্বচ্ছন্দে একত্র বাস কবিতেন। নৃপতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য, উভয প্রভাবেব বশীভূত দৃষ্ট হইযা-ছেন। একাদশ শতাব্দীতে, চোল কর্ত্তৃক কাঞ্চি হইতে, পল্লব তাড়িত হইযাছিল। ইহাদের শেষ অবস্থায়, অনিরুদ্ধথের নামে এক সঙ্ঘ নায়ক বাস করিতেন। তিনি পালী ও সংস্কৃত গ্রন্থকার। থেব শব্দ বঙ্গ-দেশে জাতিদ্যোতক। ইহাতে আমি থিয়ব বুঝি। এই শ্রেণী, এক্ষণে সামাজিক সম্মানে অতি হীন। শিক্ষাব সুযোগ নাই। বৌদ্ধমত, হীনকে মহৎ করিতে, তজ্জন্য সদ্ধর্ম্ম পদবাচ্য হইযাছিল। বুদ্ধ-মুখনিঃসৃত গল্প সংগ্রহ দ্বারা, তিনটী পেটাকা পূর্ণ হয়। তন্মধ্যে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না। কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, কেবল ভোগবাদী হইবে, অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, এইরূপ কথনশীল হয়। সে আসক্তি-বহিত এবং নিষ্পাপ হইলে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

নচাহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি, যোনিজংমত্তিসম্ভবং।
ভোগাদি নাম সো হোতি, সো চে হোতি
সাকিঞ্চনো।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং॥
(ধম্মপদ)।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১১। জাতিভেদ। শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ১৲। এরূপ সহৃদযতা-পূর্ণ পুস্তক আমরা অল্পই পড়িয়াছি। গ্রন্থকাব অসাধাবণ গবেষণা বলে প্রতিপন্ন কবিযাছেন, "নিম্ন-শ্রেণীকে" অগ্রাহ্য করা সমীচীন নয। গ্রন্থকাবের লিপি-চাতুর্য্য ও গবেষণা অসাধাবণ এবং তাঁহার হৃদয়খানি উদারতা এবং মহত্ত্ব পূর্ণ। এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি এ দেশে অমর হইবার যোগ্য। বিধাতা তাঁহাব মনোবঞ্ছা পূর্ণ করুন।

১২। কাছাড়েব ইতিবৃত্ত। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, বি-এ, প্রণীত, মূল্য ১৲। এই ইতি-হাসখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। নাথ জাতির বিবরণে আছে—"ইহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় জননে মরণে দশ দিন অশৌচ ধারণ করে; কিন্তু মৃতদেহ মুখাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করতঃ যোগাসনে

বসাইয়া সমাধিস্থ করিয়া থাকে। ইহারা স্বশ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা দেবদেবীর পূজা ও বিবাহাদি করাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদিতে অন্ন পিণ্ড প্রদান করে। ইহারা আবাস-গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বড়ই যত্নবান। ইহাদের মধ্যে বাল্য ও বহু বিবাহ প্রচলিত নাই।" গ্রন্থখানি অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুখ-পাঠ্য।

১৩। ছায়া-চিত্র। নাটক। শ্রীআনন্দ দাস শর্ম্ম-প্রণীত, মূল্য ।৵০। মহাশ্বেতা অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত। ভাষা ভাল।

১৪। সতীর জয়। নাটক। ঐ ঐ গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ।৵০। সাবিত্রী সত্যবান কাহিনী যত পাঠ করা যায়,ততই মধুর লাগে। গ্রন্থকারের নাটক লিখিবার ক্ষমতা আছে।

১৫। ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব-তরঙ্গ। সুচিন্তিত প্রবন্ধ। পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। প্রণিধানের উপযুক্ত পুস্তক।

১৬। কবিতা-কেশরী। শ্রীহরেরাম সান্যাল প্রণীত, মূল্য ॥০। ৩০টী সন্দর্ভ আছে। কয়েকটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে।

১৭। ভারত-ভিক্ষা। শ্রীফণীন্দ্রমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৶০। কবিতা পুস্তক। পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল, পাগলের গোবধে আনন্দ। দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

১৮। কর্ম্মযোগী শশিপদ। শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন প্রণীত। মূল্য ৵০। খোসামুদী এবং যশোলিপ্সার অপূর্ব্ব চাটনি।

১৯। The fourth Annual Report of the Devalaya for the year 1911.

২০। The Devalaya (its aims & objects) Sitanath Tattabhusan, price As 4 কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন যেমন, এ সবও সেইরূপ। তবু পড়িতে হইবে, তবু সমালোচনা করিতে হইবে! জগজ্জয়ী প্রয়াসের উচ্ছ্বাস। কি আর লিখিব! বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এবং সৎকাজের অনুষ্ঠান হইলে মঙ্গল-প্রসূ হউক।

২১। আদর্শ-শিক্ষা। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কর প্রণীত, মূল্য ৵১০। বিলাতী কাগজে দেশের জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্বোধন। ফলের নাম প্রভৃতি কবিতাতে কৃতীত্ব আছে। চর্চ্চা রাখিলে কালে ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

২২। অর্থনীতি। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৲। পলিটিকেল একনমির বাঙ্গালা বিবৃতি। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। অনেক জ্ঞাতব্য কথা সরল এবং সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার মাতৃভাষার একজন অক্লান্ত সাধক। কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া তিনি ভাষার সেবা করিতেছেন। যেমন চিন্তা, তেমনই গবেষণা, যেমন রুচি, তেমনই শিক্ষা। গ্রন্থকারের জয়-জয়কার দেশ ধন্য হউক এবং সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হউক।

২৩। প্রবন্ধ-লহরী। শ্রীমহেশচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য ৸০। ১০টী সন্দর্ভ এই পুস্তকে আছে। লেখক মাতৃভাষার একজন আদর্শ সাধক। 'এই পুস্তকের দুটী সন্দর্ভ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে মতামত দিতে অক্ষম, অন্যান্য সন্দর্ভের দুটী বান্ধবে, দুটী আর্য্যপ্রভায়,একটী আবর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অন্য কয়েকটী নূতন। লেখকের চিন্তাশীলতা ও ভাষা-জ্ঞান বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি অবস্থাপন্ন লোক হইয়াও জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হইলে যারপর নাই সুখী হইব।

২৪। অশোকবনে সীতা। জনৈকা দুঃখিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বিরচিত, ১৬১ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমন্মথনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। প্রাচীনা বিধবা মহিলার লেখা। দুঃখের কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত। নানা দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও আমরা লিখিতে বাধ্য, এ পুস্তকখানি পরিপাটী হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির যুগে এ পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হইবে; আমরা আশা করি। এই ভদ্র-মহিলার জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই। সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহার এক এক খানি ক্রয় করিলে মহিলার জীবন ধারণের উপায় হইবে। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

রামচন্দ্র—উত্তর-রামচরিত।

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণে মহাকবি ভবভূতি বাল্মীকির আদর্শ অনুসরণ করেন নাই; কবির আত্মশক্তির উপর প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তিনি ভাবরাজ্যের রাজরাজেশ্বর। তাঁহার হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের যে আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও ভাবের উজ্জ্বল আলেখ্য—বীরত্বের নহে। প্রেম, নিরভিমানিতা, স্বার্থ-ত্যাগ, বিনয়, প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি অশেষ-বিধগুণ যাঁহার চরিত্রের উপাদান, তাঁহার চরিত্র বীরত্বব্যঞ্জক না হইলেও আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। যাহা লোকের চিরবাঞ্ছিত সম্পদ, যাহা পাইলে লোক দেব-প্রকৃতি লাভ করে, শ্রীরামচরিত্রে প্রচুর পরিমাণে যদি তাহা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আসুরিক শক্তির একটু হ্রাস দেখিয়া ম্রিয়মান হইব কেন? যে শ্রীরাম-চন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য প্রাণসর্ব্বস্বা সীতা-দেবীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, নবরাজ্যা-ভিষিক্ত হইয়া সেই শ্রীরামচন্দ্র প্রজাগণকে কিরূপ ভাবে পালন করিতেন, আত্মীয়বর্গের সঙ্গেই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেন, মহাকবি গ্রন্থের প্রারম্ভেই রামভদ্র ও কঞ্চুকীর কথা-বার্ত্তায় তাহা প্রকাশ করিতেছেন:—

কঞ্চুকী। রামভদ্র! মহারাজ!

রাম। [সস্মিতম] নন্থু, রামভদ্র ইত্যেব মাং প্রতি উপচার শোভতে তাত পরিজনস্য তৎ যথাভ্যস্তমভিধীয়তাম।

পিতার পরিজনের রামভদ্র সম্বোধনই উপযুক্ত, অতএব অভ্যাসানুযায়ী সম্ভাষণ করুন।

পিতার পরিজনবর্গের প্রতি নবরাজ্যাভি-ষিক্ত শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ বিনয় নম্র সম্ভাষণ, তাহাতে যে তিনি বড়ই নিরভিমানী পুরুষ, তাহা সহজেই বোধগম্য হইল। অযোধ্যার সম্রাটের এ নিরভিমানিতা সামান্য নহে। এই শ্রেণীর সম্রাটকে ইহা আশ্রয় করিলে, রাজ্য যে সুনিয়মে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা কে না ধারণা করিতে পারেন? মহা-কবি রাজার চরিত্র অঙ্কিত করিতে যাইতেছেন, রাজা যে গুণটী লাভ করিয়া প্রজাদের নিকট ভক্তির যোগ্য হয়েন, আমরা দেখিলাম, সেই মহৎ গুণটী রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তেজস্বী রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছে। ইহার পর-ক্ষণেই শ্রীরামচন্দ্রের আরও একটী প্রধান গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, সেটী আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে নিরুৎসাহিতা। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ যখন সীতাদেবীকে চিত্রপট পরিদর্শন করাইতেছিলেন, তখন বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র উভয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান। ঐ চিত্রটীতে শ্রীরামচন্দ্রের তেজস্বিতা ও পরশুরামের নিগ্রহাবস্থার বর্ণনা ছিল। সুধীর লক্ষ্মণ রঘুনন্দনের বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র দেখাইয়া ও তাঁহার বীরোচিত কার্য্য তৎসাহায্যে স্মরণ করাইয়া সীতাদেবীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রঘুনন্দন আত্ম-প্রশংসা-সূচক দৃশ্যটী প্রত্যক্ষ করিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন:—

বহুতরং দ্রষ্টব্যমস্ততো দর্শয়।

দেখাইবার ঢের জিনিষ আছে, অন্য বিষয় দেখাও। আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে এরূপ নিরুৎ-

সাহিত মহাপুরুষ আর কোথায়ও দেখিয়াছ কি? এই সব ব্যাপারে দেখা যায় যে, রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বদাই তাঁহার চরিত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। যে ভাব অহরহ সাধারণ লোকের হৃদয়-সাগরে উদিত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, যাহা অন্যে লক্ষ্য-যোগ্য মনে করে না, শ্রীরামচন্দ্র তাহাতেই কতদূর মনোযোগশালী! রাজার রাজকীয় কার্য্য কিরূপ বিষম দায়িত্বপূর্ণ, তাহা শ্রীরামচন্দ্রই আমাদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে পারিয়াছেন। প্রকৃত রাজার গুণ আয়ত্তাধীন করার জন্য রাজ্য-প্রাপ্তির পরই শ্রীরামচন্দ্র যে কঠোর স্বার্থত্যাগে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়েন? রাজার রাজ্য পরিচালন যে একটী বিষম দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, ইহা কাহার নিকট হইতে শ্রীরামচন্দ্র অবগত হইয়াছিলেন? অনেকটা তাঁহার চিরপূজ্য গুরু বশিষ্ঠের নিকট হইতে। বশিষ্ঠ অষ্টাবক্রের নিকট বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমরা জামাতৃ-যজ্ঞে আবদ্ধ রহিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র নূতন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যদি প্রজারঞ্জনে যত্ন হইয়া যশস্বী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাই আমাদিগের পরম ধন।" গুরু-ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন:—

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তিমে ব্যথা॥

লোক আরাধনার জন্য দয়া, সৌখ্য, এমন কি জানকীকে ত্যাগ করিয়াও, আমি তাহাতে বেদনা অনুভব করি না।

এই জানকীর বিশুদ্ধ চরিত্রে শ্রীরামের কতদূর বিশ্বাস ছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন:—

নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্যেবসিদ্ধা।
মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্নচরণৈরবতাড়নানি॥

সুস্নিগ্ধ কুসুম লোকের মস্তকেই অবস্থান করে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, উহা চরণ অবমর্দ্দনের যোগ্য নহে।

এখন বুঝা গেল, সীতার চরিত্র শ্রীরামচন্দ্রের কেবল বিশ্বাস্য নহে, উহা তাঁহার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। এ অবস্থায় যে রাম-সীতার ভালবাসা, অতলস্পর্শ সমুদ্রের ন্যায় গভীর, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ভালবাসার সেই গভীরতা মহাকবি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মণ যে সময় চিত্রকূট পর্ব্বত যাওয়ার পথে কালিন্দীতটের শ্যামবট সীতাকে দেখাইতেছিলেন, তখন সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতে লাগিলেন—

অলসলুলিত মুগ্ধাল্যধ্ব সঞ্জাতখেদা—
দশিথিল পরিবর্ত্তৈর্দত্ত সংবাহনানি।
পরিমুদিত মৃণালী দুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মমকৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥

যে প্রদেশে তুমি পথশ্রান্তিহেতু অলস শিথিল মনোহর বিদলিত মৃণালতুল্য দুর্ব্বল অঙ্গ গাঢ় আলিঙ্গনার্থ আমার বক্ষে রাখিয়া নিদ্রা যাইতে, সেই প্রদেশ এই।

বনবাস সময়ের ঘটনা সীতাকে স্মরণ করাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের আর এক স্থানে বলিতেছেন:—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তি যোগাৎ
অবিরলিত কপোলং জল্পতো তোর ক্রমেণ
অশিথিল পরিরম্ভব্যপূতৈকৈকদোষেণা
অবিদিত গতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীত্॥

গাঢ় সংসর্গহেতু উভয়ের গণ্ডস্থল নিরন্তর সম্মিলিত ছিল, আমরা পর্য্যায় ব্যতিক্রমে

বিভিন্ন গল্প করার সময় পরস্পরের দুই বাহু দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিলাম, সেই সময় রাত্রি যেন অজ্ঞাত ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইরূপ স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসা-সূচক বর্ণনা বিরল। পাশ্চাত্য কবি সেক্সপীয়রের Tempest কাব্যই বল, আর প্রাচ্য কবি কালিদাসের শকুন্তলাই বল, প্রেম কিরূপ পরিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে লোকের চিত্ত উদার করে, মহাকবি ভবভূতির কাব্যে তদ্বিষয় যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছেন, অন্য কোন কবিই তদ্রূপ কোন কাব্যে দেখাইতে পারেন নাই।

সুখ কি দুঃখ, প্রমোহ কি নিদ্রা, বিষ-বিসর্প রোগ বিশেষ বা মদ্যপান-মোহ-মিশ্রিত আনন্দ বিশেষ, ইহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার প্রতিস্পর্শে বিকার ইন্দ্রিয়-গণকে মোহিত করিয়া চৈতন্য বিলুপ্ত ও সম্মিলিত করিতেছে।

সীতা-সহবাস-সুখে রামচন্দ্র কতদূর উল্লাসিত হইতেন, তাহা মহাকবি উল্লিখিত কয়েকটী অতুলনীয় কবিতা দ্বারাই বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার পরই মহাকবি এই ভালবাসার মূলচ্ছেদী একটী ঘটনা সৃষ্টি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জীবনস্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন। সে ঘটনাটী এই, দুর্মুখ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

উপস্তবন্তি দেবং পৌরজানপদাঃ বিস্মরিতারয়ং মহারাজ দশরথস্য রামদেবেনেতি।

পৌরজানপদবর্গ দেবকে স্তব করিতেছে। (তাহারা বলিতেছে) আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে পাইয়া দশরথ রাজাকে ভুলিয়া গিয়াছি।

পিতৃভক্ত শ্রীরামচন্দ্র আত্ম-প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় বিচলিত হইলেন না। দশরথ রাজার প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল, তিনি বিস্মরণ করিতে পারিলেন না যে, তাঁহার গুণধর পিতা অপেক্ষাও তিনি প্রজাবর্গের নিকট অধিকতর শ্রদ্ধেয়। তিনি তখনই দুর্মুখের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

অর্থবাদ এষঃ। দোষস্তমে কিঞ্চিৎকথয়, যেনস প্রতিবিধীয়তে।

এসব স্তাবকতা। তুমি আমার দোষের কথা বল, যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি।

কয়জন রাজা লোকের মুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃক্‌পাত-শূন্য হইতে পারেন? কত জন রাজারা আত্মদোষ অনুসন্ধান করিয়া প্রজামণ্ডলীর শান্তির জন্য তাহা সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন? শ্রীরামচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, প্রজার সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, অনেকটা তাঁহার উন্নতি ও অবনতির উপর নির্ভর করে। তিনি উন্নত হইলে যদি সকল লোক শান্তিতে থাকিতে পারে, তাহা হইলে তিনি উন্নত হইতে যথোচিত চেষ্টা না করিবেন কেন? অতঃপর তিনি শুনিলেন, প্রজামণ্ডলী সীতাচরিত্রে দোষারোপ করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে যেন এই সংবাদে বজ্র পড়িল। তিনি ঐরূপ তীব্র প্রাণান্তক উক্তি শ্রবণ করিয়া মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হা দেবি দেবযণ সম্ভবে। হা স্বাদন্মানুগ্রহ পবিত্রীকৃত বসুন্ধরে। হা জনকবংশ নন্দিনি। হা পাবকবশিষ্টারুন্ধতী প্রশস্ত শীলশালিনি। হা রামৈকজীবিতে। হা মহারণ্যবাস প্রিয়সখি। হা তাত প্রিয়ে। হাস্তোক প্রিয়বাদিনি! কষ্টমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।

ত্বয়াজগস্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ
নাথবন্তস্তু যা লোকাস্তু মনাথা বিপৎস্যাম॥

তোমাদ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র, তোমার প্রতি লোকে কুৎসিত অপবাদ আরোপ করে, এই পৃথিবী তোমাদ্বারা সহায সম্পন্ন, তুমি সহায়হীনা হইয়া বিপদগ্রস্ত হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ অনেক হৃদয়-বিদারক বিলাপ করিয়া সাধ্বী স্ত্রীকে বর্জ্জন করিলেন। এই সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ ভার্য্যা ছিলেন, তাহার বাক্যগুলিই বা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কত প্রীতিপদ হইযাছিল, মহাকবি তৎসম্বন্ধে যে প্রাণ-জুড়ান কথা বলিতেছেন, তাহা এই—

ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয মোহনানি।
এতানিতে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসাযনানি॥

হে ইন্দীবর-নয়নে! তোমার এই বাক্যগুলির সংসার-চিন্তা-পরিম্লান জীবনরূপ কুসুমের পরিস্ফুটক, আত্মার তৃপ্তিদায়ক, ইন্দ্রিয়গুলির মোহোৎপাদক, কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের উৎসাহ-শক্তি-বর্দ্ধক ঔষধ স্বরূপ।

সীতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট—

ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তি র্নযনযোঃ
অসবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুল চন্দনরসঃ।
অয়ংকণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যাঃন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥

আমার গৃহে ইনি লক্ষ্মীস্বরূপ, আমার নয়নে অমৃতময়ী অঞ্জনশলাকা স্বরূপ, প্রিযার এই স্পর্শ গাত্রে বহুল চন্দন রসের ন্যায় সুখপ্রদ, যদি ইহার বিরহ অসহ্য না হইত, তবে কিনা প্রীতিপ্রদ হইত।

সীতা যখন তাঁহার এত প্রাণতোষিণী ভার্য্যা, তখন কি উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়া যন্ত্রণার অতল সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন? মহাকবি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যত পুরিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা॥

ভবভূতির রচনার সৌন্দর্য্য ও ভাব গ্রহণ করিতে পারিলে বোধ হয় লোক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। উপরে যে রাম-সীতার প্রগাঢ় প্রেম-সূচক কবিতা সংনিবদ্ধ করিয়াছি, উহা শ্রীরামচন্দ্রের অতীত সুখস্মৃতির মনোমোহন চিত্র। সীতা নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে ও সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ অনুরাগ ছিল, তাহা দেখাইতে পারিলে, তাহার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজানুরাগিতার তুলনা করা যাইতে পারিবে। মহাকবি এখন তাহাই দেখাইবার জন্য চিত্রদর্শন ব্যাপার ক্ষান্ত করিলেন। সীতাকে বাতায়নোপকণ্ঠে শ্রান্তি-হরণ জন্য নিদ্রাভিভূতা করাইলেন, এবং শ্রীরামচন্দ্র বর্ত্তমান সময়ও সীতা-সহবাস সুখে কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য সীতা পার্শ্বস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দিয়া বিনিঃসৃত করিলেন—

বিনিশ্চেতুং শক্যোন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্প কিমুমদঃ।
তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিযগণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমিলয়তি চ॥

"লোকের আরাধনা করা সাধুব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয় এবং এইটী তাহাদের পক্ষে মহৎব্রত-স্বরূপ, কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"

মহাকবি বুঝাইয়া দিলেন যে, লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র নিষ্কলঙ্কিনী সীতাকে

বর্জ্জন করিলেন, কুল-কীর্ত্তি-রক্ষণশীল রাজার লোক-আরাধনাই যে ব্রতস্বরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে নিরপরাধিনী শরণাগতা, আজন্ম-বিশুদ্ধা, তাহাকে রক্ষা করাও কি রাজার একটা মহৎব্রত নহে? সীতা বিসর্জ্জিতা না হইলে রাজ্যটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। প্রাচীন রাজ্যটা বড়, না আজন্ম-পবিত্রা সীতা বড়, যদি ইহাই বিচার্য্য হইত, তাহা হইলে ইহার বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর অর্পণ করিলেই চলিত। মহাকবি ভবভূতি আমাদিগকে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র কেবল প্রজারঞ্জনের জন্যই সীতাকে বিসর্জ্জন করেন নাই, শ্রীরাম-চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যশোলাভে শ্রীরামচন্দ্রের একটা প্রবলস্পৃহা ছিল। সীতা-বর্জ্জনের সময় সেই স্পৃহাটী তাঁহার অন্তরের ভিতর এত লুক্কায়িত ছিল যে, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সীতাত্যাগের সমর্থনোপযোগী ঐ একটীমাত্র কারণ পাইয়া সীতা-ত্যাগ করিলেন। মহাকবি ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রের মনে যশঃস্পৃহা বলবতী করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বর্জ্জন কেবল লোক-আরাধনার জন্য নহে, ইহার ভিতর স্বার্থের দুর্গন্ধ আছে, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের এই কার্য্য অসঙ্গত হইয়াছে।

সীতা-বিসর্জ্জনের কিছুকাল পরে শূদ্রকবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন, ঈশ্বর-নিষ্ঠ শূদ্রককে তথায় দর্শন পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ হস্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্তশিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুণো কৃপাণম্।
রামস্য গাত্রমসি দুর্ব্বহগর্ভ খিন্ন,
সীতা বিবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে॥

দক্ষিণ হস্ত! মৃত ব্রাহ্মণ-শিশুর জীবনরক্ষার নিমিত্ত শূদ্রমুনিকে খড়্গাঘাতে নিহত কর। যে বাম দুর্ব্বহ গর্ভভারে মন্থর সীতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছে, তুমি সেই বামেরই অঙ্গবিশেষ, তোমার আবার দয়া! শম্বুক শূদ্রক যেমন তেমন লোক নহেন; শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে মুনি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অবহেলার অপরাধে তিনি শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। শূদ্রকবধের বৃত্তান্ত বাল্মীকির রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যভয়ে রামায়ণের কোন অংশই এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। স্বার্থপর একাধিপত্য ব্রাহ্মণদের কুশাসনে ও কুসংস্কারে ধর্ম্মের কতদূর গ্লানি উপস্থিত হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রের শূদ্রকবধেই তাহার সিদ্ধান্ত করা যায়। শূদ্রকবধ যে নিষ্ঠুর কার্য্য, তাহা বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্রের কথায়ই প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ দোষী করার পূর্ব্বে, স্বার্থ-দুষ্ট ব্রাহ্মণদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিষয়ক অনুশাসনগুলি বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। উহা বিচার করিতে গেলে, ধর্ম্মনিয়ম-সংস্থাপক ব্রাহ্মণগণকেই উক্তকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম দায়ী করা যাইতে পারে।

শূদ্রক মুনি শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দিব্যদেহ ধারণ করিল এবং শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করিয়া অরণ্য দেখাইতে দেখাইতে জনস্থানের দিকে নিয়া চলিল। শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী দর্শন করিয়া শোকে অধীর হইয়া বলিলেন :—

অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরন্তোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ
উৎপীড় ইবধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতিমাম্॥

হা প্রিয়ে জানকি!

অন্তরে লীন ভীষণ শোকানলের ঘনীভূত

ধূমরাশি-তুল্য মোহ আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন করিতেছে, হা প্রিয়ে জানকি। ছায়া-রূপিণী সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে সুস্থ করার জন্য তাহার দেহ পাণি-স্পর্শ করিলেন,* সীতা এইস্থানে কোন সময় আসিয়াছিলেন। তাহা সীতা-চরিত্র বিশ্লেষণ সময়ে বলিয়া রাখিয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র সেই স্পর্শে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রচ্যোতনং নু হরিচন্দন পল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নুসেকঃ ?
আতপ্তজীবন মনঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনোষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্ত ?
স্পর্শ পুরাপরিচিতো নিয়তং স এষ
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ প্রতিহত্য মূর্চ্ছা—
মানন্দলেন জড়তাং পুনরাতনোতি।

ইহা কি চন্দন-বৃক্ষপল্লবের রস ? না আমর্দ্দিত সুধাংশু রশ্মি-সমূহের রসধারা ? সন্তাপদগ্ধ জীবন মনের শান্তিকারক সঞ্জীবন ঔষধ যেন আমার হৃদয়ে প্রলিপ্ত হইয়াছে।

এ স্পর্শ পূর্ব্বের পরিচিত, এবং মনের উৎসাহ ও আনন্দদায়ক। এই স্পর্শ সীতা-বিয়োগ মূর্চ্ছা ঝটিতি নিবারণ করিয়া আনন্দ-জনিত মূর্চ্ছা আনয়ন করে।

সীতা পূর্ব্বে এই পঞ্চবটী বনে বাসকালে একটা ময়ূর শিশুপালন করিয়াছিলেন, স্বহস্তে একটা কদম্ব-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, সীতার সখী বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সীতাশোক উদ্দীপিত করার জন্য তাহাকে বলিলেন :—

ইতোঽপি দেবঃপশ্যতু।
অতরুণ মদতাস্তরোৎসবান্তে
স্বয়মচিরোদ্গত মুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি সএষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥

দেব, এই দিকে দেখুন। নবোৎপন্ন মনোজ্ঞ চঞ্চল-শিখাযুক্ত সীতার পুত্রীকৃত ময়ূর অতি হর্ষে নৃত্যাদি মহোৎসব সমাপন করিয়া ময়ূরীর সঙ্গে মণিময় শিরভূষণধারীবৎ কদম্ববৃক্ষে রব করিতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের তখনই সীতার কৌতুক-প্রিয়তা স্মরণ পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন —

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্ম্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষু
প্রচলিত চতুরভ্রূতাণ্ডবৈস্মণ্ডয়ন্ত্যা।
কপিকিসলয় তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্ত্যমানম্
স্মৃতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥

মুগ্ধা সীতা পল্লব-সদৃশ-করে তাল দিয়া তোমাকে নাচাইতেন, তুমিও নাচিতে নাচিতে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকিতে, তোমাকে অনুসরণ করিতে গিয়া প্রিয়ার চক্ষুর গোলোকদ্বয় চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিত এবং চঞ্চল বিলাসময় ভ্রূযুগল পরিচালিত হওয়ায় চক্ষুর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইত। আমি এখন স্নেহপূর্ণ মনে তোমাকে সেই অবস্থায় স্মরণ করি।

ক্রমান্বয়ে শ্রীরামচন্দ্র পাদচারণ করিতে করিতে সীতার স্বহস্ত-রচিত বৃক্ষ, পালিত-শকুনি ও কুরঙ্গগুলি অবলোকন করিলেন। অতঃপর কদলী-বনমধ্যবর্ত্তী এক শিলাতলে পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র শয়ন করিলেন। সেই শয়নীয় শিলাতলে বসিয়া সীতা কতকগুলি হরিণশিশু পালন করিয়াছিলেন। সেই হরিণগুলি তখন সেই শিলাতল পরিত্যাগ করিত না। বাসন্তীর সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র এই দৃশ্যটীও প্রত্যক্ষ করিলেন। এই সব

* বর প্রভাবে সীতা শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনীয়া হইয়াছিলেন।

দৃশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বলিলেন :—

ইদং তাবদশক্যমেবদ্রষ্টুম্।

আমি ইহা আর দেখিতে পারিতেছি না। এই বাক্যটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটীর সংযোজনায় শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়খানি যতটা খুলিয়াছে, অন্য কোন বাক্য এইস্থলে প্রযুক্ত হইলে ইহার এত গভীর ভাব-প্রকাশক হইত কি? কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় চিত্তের গতি ধাবিত হয়, যাঁহারা তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা এরূপ ক্ষুদ্র কথায় চরিত্রটী খুলিয়া দেখাইতে পারেন না। মহাকবির ভাব জগতে এত আধিপত্য ছিল বলিয়াই কোন সময় কোন বাক্যে কোন হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, তাহা ভালরূপ বুঝিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন সেই দৃশ্যে নিতান্ত অভিভূত হইয়া শিলাতলে বসিয়া বলিতে লাগিলেন :—

করকমল বিকীর্ণৈর্বধূনীবার শষ্পৈ
স্তৃকশকুনি কুরঙ্গান মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মমবিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রবইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদ যোগ্যঃ॥

সীতার করকমল বিকীর্ণ-জল নীবারধান্য এবং নবোদ্গত তৃণদ্বারা যে বৃক্ষ, পক্ষী ও হরিণগুলিকে পালন করিয়াছিল, সেই বৃক্ষ, পক্ষী ও হরিণগুলি দৃষ্টি করিয়া প্রস্তর-বিদারণ-যোগ্য দ্রব্যের ন্যায় হৃদয়ের কোন অনির্ব্বচনীয় বিকার আবির্ভূত হয়।

বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা-বিসর্জ্জনের জন্য ভর্ৎসনা করিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই ভর্ৎসনায় বুঝিলেন, সীতার সঙ্গে পুনর্মিলন হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প। শ্রীরামচন্দ্র তখন সীতা দর্শন-আশায় একেবারে হতাশ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

ত্রস্তৈকহায়ন কুরঙ্গ বিলোল দৃষ্টে—
স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভ ভরা বসাযাঃ
জ্যোৎস্নাময়ী চ মৃদুবাল মৃণালকল্পা
ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিযতং বিলুপ্তা॥

ভয়াদি কম্পিত গর্ভভারে মন্থর কুরঙ্গনয়না সীতার চন্দ্রিকারং স্নেহলাবণ্যময়ী কোমল-মৃণালাঙ্কুর-স্পর্শ-ভঙ্গুর দেহলতা নিশ্চিতই মাংস লোলুপ শ্বাপদ কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহাকবি ভবভূতি করুণরসের উদ্দীপনায় কতদূর পারদর্শী, শ্রীরামচন্দ্রের এই বিপ্রলম্ভ দ্বারাই তাহা বিশেষরূপ প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্রকে মহাকবি মূর্ত্তিমান প্রেমরূপে অবতরণ করিয়াছেন, রাম-চরিত্র তাঁহার তুলিকায় যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, সে ভাব বড়ই বিস্ময়কর।

দলতিহৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধানতুভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়োমোহং ন মুঞ্চতিচেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুস্তদ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাত্
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্।

প্রিয়ার বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে উহা বিভক্ত হইতেছে না। আমার অবসন্ন শরীর ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যহীন হইতেছে, কিন্তু বহুক্ষণ সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া থাকিতেছে না। দৈব মর্ম্মচ্ছেদে উদ্যত হইয়া আমাকে পীড়ন করিতেছে, কিন্তু প্রাণহরণ করিতেছে না।

দেব্যাশূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ
প্রণষ্টমিব নামাপি ন চ রামো ন জীবতি,

সীতা-শূন্য জগৎ দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিতেছে, তাহার নাম এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রামচন্দ্র এখন জীবিত!

চণ্ডি জানকি! ইতস্ততো দৃশ্যসেইবনচান্নুকম্পসে
হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ

শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নদ্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবাস্তরাত্মা,
বিষ্ঠত মোহঃ স্থগয়তি,কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি।

হে চণ্ডি জানকি। চতুর্দ্দিকে তোমায় দেখিতেছি, কেন আমার প্রতি সদয় হও না? হা দেবি! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইতেছে, এ জগৎ শূন্য মনে করিতেছি, অন্তরজ্বালায় অবিরত জ্বলিতেছি, কাতর অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে, মোহ সমস্ত পদার্থ আবৃত করিতেছে। আমি মন্দভাগ্য, এখন কি উপায় করি। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের এদারুণ যন্ত্রণায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় ও ললাট করস্পর্শ করিলেন, সেই স্পর্শ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কত মধুর!

আলিম্পন্নমৃত ময়ৈরিব প্রলেপৈ
রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা
দানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্।

আমি যে স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সে যেন অমৃতময় প্রলেপে আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক মাংসরক্ত প্রভৃতি শারীরিক ধাতু-সমূহকে প্রলিপ্ত ও আমাকে জীবিত করতঃ অকস্মাৎ পুনরায় হর্ষজনিত অন্যপ্রকার মোহ সৃষ্টি করিতেছে।

বাসন্তী। সে কিরূপ?

রাম। সখি! জানকীকে পুনরায় পাইয়াছি।

রাম। সে কই?

রাম। সে আমার সম্মুখে, তুমি কি দেখিতেছ না?

বাসন্তী। হে দেব! এই মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ প্রলাপে প্রিয়সখীর দুঃখে দগ্ধ মন্দভাগিনী আমাকে পুনরায় দগ্ধ করিতেছে।

রাম। সখি! কুত প্রলাপাঃ
গৃহীতো যঃ পূর্ব্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণবর
শ্চিরং স্বেচ্ছাস্পর্শৈরমৃতশিশিরৈ র্যঃ পরিচিতঃ।
স এবায়ং তস্যাস্তহিন নিকরোপম্যসুভগো
ময়ালব্ধঃ পাণির্লিতলবলীকন্দলনিভঃ॥

বিবাহ-সংস্কার-বাসরে যে কঙ্কণ-শোভিত পাণি ধারণ করিয়াছিলাম, সেই অমৃতমাখা সুখকর স্পর্শ আমার চিরকাল স্মরণ আছে। সীতার সেই লবলী-পল্লব-সদৃশ শীতল সন্তাপহারক সুকুমার-কর অদ্য পাইয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্র সেই সুখময় করস্পর্শে মনে করিলেন, তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়াছে, তিনি বাসন্তীকে উহা ধরিতে অনুরোধ করিলেন, সীতা সলজ্জে হস্ত টানিয়া লইলেন, শ্রীরামচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেবি! প্রসন্না হও, আমাকে এইরূপ ভাবে ত্যাগ করিওনা। বাসন্তী সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, অলৌকিক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার সীতাবিরহ-শোকক্লিষ্ট প্রাণ স্থির করুন। প্রিয়সখী আমার সীতা এখানে কোথায়?

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করিলেন—

ব্যক্তং নাস্তি, কথমন্যথা বাসন্তী অপি তাং নপশ্যেত্ অপিখলু স্বপ্নএষস্যাত্ ন চাস্মি প্রসুপ্তঃ কুতোবারামস্য স্বপ্ন, সর্ব্বথা স এবৈষ ভগবাননেকবার পরিকল্পিত নির্ম্মিতা বিপ্রলম্ভঃ পুনঃ পুনরনুবধ্নাতি।

সত্যই এ সীতা নহে, নতুবা বাসন্তী তাহাকে দেখেন না কেন? আমি কি তবে স্বপ্ন দেখিতেছি, না নিদ্রাভিভূত আছি, রামের স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে? হে ভগবন! অনেকবার কল্পনায় মোহন ছবি আঁকিয়াছি, ভ্রম পুনঃ পুনঃ আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

অতঃপর তমসা সীতাকে গোদাবরী তীরে লবকুশের বর্ষবর্দ্ধন মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য গমন করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতা-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া বলিলেন :—

অস্তি চেদানীমশ্বমেধায় সহধর্ম্মচারিণীমে। অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ আমার সহধর্ম্মিনী আছে সীতা। [সাক্ষেপং স্বগতম] আর্য্যপুত্র। কা সা ? রাম। হিরণ্ময়ী সীতায়াঃ প্রতিকৃতি।

শ্রীরামচন্দ্রের কথার পূর্ব্বে সীতার স্বগত কথাটী সন্নিবিষ্ট করিয়া মহাকবি ঐস্থানটী কত মধুর করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সীতা কতদূর প্রিয় ছিলেন, তাহা এই হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতির কথায়ই ভালরূপ অনুধাবন করা গেল। শ্রীরামচন্দ্র যখন আর সীতাকে পাইবেন না, তখন তাহার সুখস্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখার পক্ষে হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি একমাত্র উপায় মনে করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহ-শোকপ্রবাহ বর্ণনার যোগ্য নহে। মহাকবির এই ছায়া অঙ্কের কবিতা গুলিতে যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও লালিত্য রহিয়াছে, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের কাতরোক্তিতে ভাবের ও প্রেমের অনন্ত উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। এই ছায়া অঙ্কের শিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়া কবিকে অসংখ্য প্রণাম করিতে হয়। এই ছায়া অঙ্কের বিষয় লিখিয়া বুঝাইবার নহে, ভাবিবার বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লব ও কুশ বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছিল, রাজর্ষি জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা সেখানে অনুপস্থিত হওয়ায়, বাল্মীকি তাহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জনক, লবের সদাচরণে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, লব তাহাকে বাল্মীকির রামায়ণ সম্বন্ধীয় যে সব প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহা অতিশয় প্রীতিজনক।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া চন্দ্রকেতু বাল্মীকির আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, লব চন্দ্রকেতুর বীরত্ব দেখিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, লব ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বীরোচিত ও উদারতাপূর্ণ। বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী উহাদের যুদ্ধ-নৈপুণ্যে ও সদাশয়তায় মোহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে তাহাদের মধ্যে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া উভয়পক্ষকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিলেন। মহাকবি এই সমর-প্রাঙ্গণে চন্দ্রকেতু ও লবকুশের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে উপস্থিত করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রাণ-প্রতিম পুত্রদ্বয়কে চিনিতেছেন না, পুত্রদ্বয়ও জানিতেছেন না, এই সর্ব্বগুণাধার শ্রীরামচন্দ্র তাহদের কে ? অথচ পরস্পর পরস্পরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। যেমন তেমন মুগ্ধতা নহে। লবকুশ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, কেন চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ? যাহাদের দর্শনে চিত্ত আর্দ্রীভূত হয়, যাহাদের বাক্যে প্রাণ সুশীতল করে, যাহাদের সদাচরণে আত্মীয়তা সূচিত হয়, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সাজে। চন্দ্রকেতুর মনেও বুঝি এই ভাব। প্রাণাধিষ্ঠাত্রী সীতা-বর্জ্জনের পর শ্রীরামচন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, একদিনের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই, উৎসাহ নাই, আজ প্রিয়দর্শন লব তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কেন এত শান্ত, স্থির ও প্রসন্ন করিতেছে ? কেনইবা ইহার প্রতি বাৎসল্য জন্মিতেছে ? শ্রীরামচন্দ্র ইহার কোনই কারণ দেখিতেছেন না, কেবল ভাবিতেছেন, কেন এমন হইল ?

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলিলেন :—

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু
র্নখলু বহিরুপাধীন প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকম্
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্ধতে চন্দ্রকান্তঃ।

অন্তঃকরণ সম্বন্ধীয় কোন একটা গূঢ় কারণ পরস্পরকে প্রণয়ে দৃঢ়াবদ্ধ করে। অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি বাহ্যিক দৃশ্য প্রীতি জন্মায় না। সূর্য্যের উদয় ভিন্ন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না, চন্দ্র উদিত হইলেই চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হয়।

অনেকেই ভক্তিশালী, স্নেহশীল ও প্রেমিক, কিন্তু তাহাদের কয়জনকে ভক্তি, স্নেহ ও প্রেমের উৎপত্তির কারণ চিন্তা করিতে দেখিয়াছ? লব চন্দ্রকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন "তাত পাদাএতে।" লব ইহা শ্রবণ করিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "চন্দ্রাবঃ খলু ভবতামেবং বাপদেশভাগিনস্তএভবন্তো রামায়ণ-কথা পুরুষাঃ তৎবিশেষঃ ব্রূহি"। চারিজনই তোমা কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধিত হইবার যোগ্যপাত্র, চারিজনের মধ্যে ইনি কোন্ জন, বিশেষ করিয়া বল। চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন 'জ্যেষ্ঠতাত'। তখন লব নিতান্ত উল্লাসিত হইয়া বলিলেন,—কথং রঘুনাথ এষঃ দিষ্ট্যা সুপ্রভাত মদ্য, যদয়ং দেবোদৃষ্টঃ। একি রঘুনাথ, ভাগ্যে অদ্য সুপ্রভাত, যেহেতু মহারাজের দর্শন পাইলাম।

লব শ্রীরামচন্দ্রের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, তিনি জানিতেন, রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র, ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। লব শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করিলেন। প্রেমের-সাগর শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন "অত ভক্তি দেখাইতেছ কেন? একবার আমায় আলিঙ্গন কর।" হৃদয়ের টানে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধ অসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "অনেকবার আমায় আলিঙ্গন কর"।

শ্রীরামচন্দ্র সেই আলিঙ্গন-সুখ ভুলিতে পারিলেন না। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে কুশ গিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দূর হইতে শ্রীরামচন্দ্র তাহার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, কোন বীর বালক আসিতেছে। কুশ সমাগত হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া বলিলেন—

অয়েন কেবলমস্মদঙ্গ সংবাদিন্যাকৃতিঃ।
অপি জনকসুতায়াস্তঞ্চ তস্যাশ্চ রূপম্
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্যে নৈপুণোল্লেখমস্তি।
নন্বু পুনরিব তন্বো গোচরীভূতমক্ষ্ণো
রভিনব শতপত্র শ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ।

সীতার সে সমস্ত লক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই শিশু দুইটীতেও উহার সৌসাদৃশ্য স্পষ্ট ভাবেই বিরাজ করিতেছে, ইহা নিপুণ ভাবে দর্শনীয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সীতার নব-বিকশিত কমল সদৃশ মুখ খানি পুনরায় আমার প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

লবকুশের দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের আশা একবার জ্বলিতে লাগিল, একবার নিভিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র এসময় আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শিশু লব তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত কিমেতত্।" শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কুশ লবকে বলিলেন—

বিনা সীতাদেব্যা কিমিবহি ন দুঃখং রঘুপতেঃ
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণংহি ভবতি
সচ স্নেহস্তাব নয়মপি বিযোগে নিরবধি
কিমিত্যেবং পৃচ্ছাস্বনধিগত রামায়ণ ইব।

সীতাদেবীর বিরহে রঘুপতির কি দুঃখের সীমা আছে? পত্নী-বিচ্ছেদে সমস্ত জগৎ

অবণ্যে পবিণত হয়, সেই প্রগাঢ় প্রণযেব পব অবিচ্ছিন্ন বিচ্ছেদ। তুমি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহাতে বোধ হয যেন তুমি বামায়ণ জান না।

কুশেব এই তটস্থিত আলাপে শ্রীবামচন্দ্রেব আব কোন আশাই বহিল না, তিনি মনে মনে স্থিব কবিলেন, এই শিশুদ্বযেব নিকট প্রশ্ন কবিযা ফল কি? দগ্ধ-হৃদয কেন তোমাব হঠাৎ বাৎসল্য-জনিত চাঞ্চল্য বলিয়াই শ্রীবামচন্দ্র মন ফিবাইতে চেষ্টা কবিলেন। ক্রমে বামাযণ সম্বন্ধে কুশ লবেব সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাবা উহাব বিষয় যাহা জানে, তাহা শুনিতে চাহিলে, তাহারা দুই একটী শ্লোক পডিযা শুনাইল। শ্রীবামচন্দ্র তাহা শুনিযা অধীব হইযা পডিলেন। বামের নিকট সীতাব অনেক কথা মহাকবি কুশ লবকে দিযা স্মবণ কবাইযা দিলেন; অবশেষ মহাকবি ভবভূতি সীতাকে শ্রীবামচন্দ্রেব কবে অর্পণ কবিবাব জন্য বাল্মীকির আশ্রমে বামাযণ অভিনয কবাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু সেই অভিনয দর্শন কবিতে উপস্থিত হইলেন। সেই বাল্মীকিব আশ্রমে সীতাব সহিত বামেব পুনর্মিলন হইল। ঋষিব প্রভাব সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, পৌবজনপদবর্গ ও প্রজামণ্ডলী উপস্থিত হইল। বামেব সহিত সীতাব পুনর্মিলন দেখিযা তাহাবা নয়ন সার্থক কবিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উত্তবচবিত-পাঠকবর্গ সাধাবণতঃ উত্তবচবিত সম্বন্ধীয় যে সব বিষয় আলোচনা কবিযা থাকেন, আমি তৎসম্বন্ধে কযেকটী কথা এবং ভবভূতিব বিষয় কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মহাকবি, শ্রীরামচন্দ্রেব সহিত সীতাব পুনর্মিলন কবাইযাছেন—রামায়ণেব কবি তাহা কবান নাই। তিনি সীতাব পাতাল প্রবেশ বর্ণনা কবিযাছেন।

সীতাব পাতাল-প্রবেশে সীতাব চবিত্রটী যেভাবে ফুটিযাছে, সেই ভাবেব দিকে ভবভূতি লক্ষ্য কবিলে, সীতা-চবিত্রেই প্রাধান্য দেওযা হইত, শ্রীবামচন্দ্রেব প্রেম-পূর্ণ-হৃদযেব কথা এত চিত্তগ্রাহী হইত না। শ্রীবামচন্দ্র যদি কান্নাকাটা কবিযাও সীতাকে না পাইতেন, সীতা যদি দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে পাতালে প্রবেশ কবিতেন, তাহা হইলে শ্রীবামচন্দ্রেব প্রতি কাহাব এত সহানুভূতিব উদ্রেক হইত? সীতাব পাতাল-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই লোকেব হৃদযে যে একটা দাগ পড়িযা যাইত, তাহা কিছুতেই উঠিত না। শ্রীবামচন্দ্রেব প্রেম অধিক পবিস্ফুট কবিবার জন্যই পুনর্মিলন সংঘটিত হইল। অনেকে জিজ্ঞাসা কবিয়া থাকেন যে, যে সব ঘটনা লইয়া বামাযণ, মহাভাবত ও পুবাণাদিব সৃষ্টি, সেই সব ঘটনা উপজীব্য কবিয়া কাব্য লেখার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নেব উত্তবে কেহ কেহ বলিযা থাকেন যে, বামাযণ, মহাভাবত, ও পুবাণাদিতে যথেষ্ট কবিত্ব ও শিল্পচাতুর্য্য আছে, উহা এক কথায লোক-শিক্ষার জন্যই বচিত, কিন্তু নাই কেবল একটী জিনিষ—কাটছাঁট। বামাযণ মহাভাবত ও পুরাণাদি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। একেত উহা উপভোগেব জন্য বিস্তব সময আবশ্যক, তৎপব আবাব উহা পডিতে পড়িতে দুই একস্থানে নিবাশ হইতে হয। যেখানে যেটুকুব বিস্তাব করিলে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, সেখানে সেটুকুব বিস্তার নাই। অথচ সকলি যেন একঘেয়ে এক সূত্রে বাঁধা। যখন সমজদাব পাঠকের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহারা সংকল্প

করিল যে, এমন ভাবে কাব্য রচিত হইবে যে, যাহাতে সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ থাকে, এবং আশার নদীতে চড়া না পড়ে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের আবির্ভাবে নবীনত্ব এই যে, যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহাই সংরক্ষিত হইয়াছে, যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বা আবর্জ্জনা, তাহা পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে পাঠকবর্গের রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইল, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিল, তাঁহারা তখন কাব্যে সন্তুষ্ট না হইয়া নাটকাদি চাহিলেন, কালিদাস ও ভবভূতি কল্পনার অমৃত-হ্রদে ডুবিয়া, ইঁহাদিগকে যে সব অমূল্য রত্ন উপহার দিতে লাগিলেন, ইহারা তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। উত্তর রাম-চরিত নাটকখানিও এই উদ্দেশ্যে রচিত। উত্তর-চরিতের ভাষা বৃহৎ সমাসবদ্ধ। কিন্তু রসহীন নহে। ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ইহার পীযূষ-রস পান করিতে হয়। রসগ্রহণের সময় যাঁহাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া না যায়, তাঁহারা ঐ রস পান করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন। ভবভূতি কেবল কবি নহেন, তিনি শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টের উপযুক্ত শিষ্য।

মহাকবি ভবভূতির একটী প্রধান গুণ, তাঁহার বর্ণনার গাঢ়িপাট্য। তিনি যখন যে বিষয়ের বর্ণনায় হাত দিয়াছেন, তখনই কৃতকার্য্য হইয়া পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার শক্তি ও প্রণালী অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক জন-স্থানের বর্ণনাই তাঁহার অলোক-সামান্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে। তাঁহার বর্ণনায় আর একটী নূতনত্ব এই, তিনি যাহা বর্ণনা-যোগ্য মনে করিয়াছেন, তাহা বিশালভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ছোট-খাট কথা তাঁহার অভিধানে ছিল না, ছোটখাট কথায় তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, সকলই বিরাট ও ভাবমূলক।

ভাবের জিনিষ কখন কি অতৃপ্তিকর হয়? মহাকবির কল্পনার বিষয় একটা প্রকাণ্ড বা নূতন কোন পদার্থ নহে, গিরি-প্রস্রবণ, নদ-নদী, অরণ্য, হস্তিশাবক, ময়ূর-ময়ূরী, গিরি, কান্তার এইগুলি কবিমাত্রেরই সম্পদ। কিন্তু তাঁহার উপাসনার একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল বলিয়াই তিনি বর্ণনার উপযোগী সামান্য সম্পদ লইয়াও আত্মশক্তি প্রভাবে অসামান্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। সাধারণ লোক যাহাতে কোন বিশেষত্ব দেখে না, কবি তাহার মধ্যেই একটা বিশেষত্ব দেখিয়া লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য রচনার যেন স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতেন। যদিও তাঁহার কল্পনা কালিদাসের ন্যায় সুদূর-ব্যাপিনী নহে, কেবল বিদর্ভেই কেন্দ্রীভূত, তথাপিও তাহার বংফলাইবার কৌশলে, ভাবের গভীরতায়, গঠনের ভঙ্গি-গুলি এবং ভাষার তেজস্বিতায় বর্ণিত বিষয় গুণে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। ভবভূতির লেখায় কালিদাসের ন্যায় উপমার ছড়াছড়ি নাই, যে দুই একটী আছে, তাহা মনোজ্ঞ ও ললিত।

কবি আদর্শ চরিত্র রচনা করিতেই বিশেষ দক্ষ ছিলেন। উত্তর-চরিতের প্রায় সকল চরিত্রই আদর্শ স্থানীয়। উত্তর চরিতের যে কোন অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার লেখা অসামান্য প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, তাঁহার চিন্তা-স্রোত বেগবান, তাঁহার আদর্শ মহান, তাঁহার হৃদয় অতিশয় প্রশান্ত, পবিত্র ও উদার। কাব্যামোদী পাঠকগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি ভবভূতির "উত্তর-রাম চরিত" পাঠ করিয়া তাহার অসামান্য শক্তিতে চমৎকৃত না হয়েন,—মনে না করেন যে, যাহা একাধারে দেখিলাম, তাহা অনুপম।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈরাগ্য।

১৬। রাজার জন্য সূপকারের (পাচকের) ন্যায় পাচক পুরুষের জন্যই লিঙ্গশরীরের সংসরণ বা গমনাগমন হয়।

কর্ম্মের প্রেরণায় ও আত্ম চৈতন্যের সন্নিধান বশতঃ পুরুষার্থ লিঙ্গদেহের ইহ পরলোকে গতি হয়। (অণিঃ)

সংসরণ এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চার।

রাজার নিমিত্ত রন্ধন কার্য্য জন্য যেমন পাচকের পাকশালায় গমনাগমনের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ পুরুষার্থ কর্ম্ম জন্য লিঙ্গদেহের বার বার স্থূল দেহ গ্রহণ হয়।

১৭। স্থূল শরীর পাঞ্চ ভৌতিক।

পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচ ভূতের পরিণামে স্থূল দেহ। এই স্থূলদেহ গ্রহণ করিয়াই লিঙ্গ-দেহের সংস্থতি বা সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম হয়।

১৮। কেহ কেহ বলেন, ইহা চাতুর্ভৌতিক।

ইহা ন্যায় মত। নৈয়ায়িকগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। আকাশ কাহারও উপাদান নহে। ইহাদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু, ভূতত্রয়াই স্থূল শরীর গঠিত।

২৯। কেহ বলেন, ইহা এক ভৌতিক।

এক ভৌতিক, অর্থাৎ কেবল পৃথিবী ভূতের বিকার। অথবা এক এক ভূতে এক এক স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়, অন্য ভূত তাহার সহকারী মাত্র। যথা মনুষ্যাদি শরীরে পৃথিবী ভূত অধিক। তাহাদের শরীর পার্থিব, প্রেত-শরীর বায়বীয়। সূর্য্য-লোকস্থিত দেবাদি শরীরে তেজের অংশ অধিক। তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকিলেও তাহার তেজ অংশ অধিক বলিয়া তাহা তৈজস্। পঞ্চম অধ্যায় দৃষ্টব্য। (বিঃ ভিঃ)

২০। চৈতন্য এই স্থূল দেহের সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। কারণ পৃথক কোন ভূতে সে ধর্ম্ম দেখা যায় না।

চৈতন্য শরীরের ধর্ম্ম নহে। ইহা আত্মার ধর্ম্ম বা স্বরূপ।

যখন কোন বিশেষ ভূতে চৈতন্য গুণ নাই, তখন ভূত সকল সম্মিলিত হইলেও (মদশক্তিবৎ ইহার) উৎপাদন হইতে পারে না।

অতএব দেহের এ চৈতন্য ঔপাধিক। পুরুষ-সান্নিধ্যে অন্তঃকরণে এই চেতনাযুক্ত হয়। তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়।

২১। চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইলে প্রপঞ্চে সকলেরই মরণাদির অভাব হইত।

মরণাদি অর্থে মরণ, সুষুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি।

যাহা যাহার স্বভাব, তাহা তাহার সমকাল স্থায়ী। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। সুতরাং চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইলে, মরণ

সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদির অভাব হইত। দেহে চৈতন্য থাকিলে মূর্চ্ছা, নিদ্রা রূপ যে দেহের চৈতন্যের অভাব অবস্থা—তাহা হইত না। দেহে চৈতন্য থাকায় মৃত্যুও হইত না।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, প্রপঞ্চের কোন পদার্থে (জড়ে) মরণ বা সুষুপ্তি নাই। দেহের অচেতন, তাই মরণ বা সুষুপ্তি। দেহে চৈতন্য থাকিলে মরণ বা সুষুপ্তি হইত না। যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না।

২২। চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় হইলেও প্রত্যেকে (প্রতি মদ্যবীজাণুতে) তাহা পরিদৃষ্ট হইত, এবং সংহতি দ্বারা তাহার উদ্ভব হইত।

মাদকতা শক্তির ন্যায় স্থূল দেহে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে সকল দ্রব্য মিলিত হইয়া মাদকতা-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার প্রত্যেক অণুতে অবশ্য মাদকতা শক্তি থাকে, দেখা যায়। তাহা মিলিত হইয়া মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু যে পঞ্চভূত মিলিয়া স্থূল দেহ, তাহার কোন অণুতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। কারণে যাহা নাই, তাহা কার্য্যে উৎপন্ন বা আকস্মিক বিকাশ হইতে পারে না।

চৈতন্য দেহে মদশক্তির ন্যায় উদ্ভূত নহে। মদশক্তি প্রত্যেক মদ্য বীজে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে। সংহত বা সম্মিলিত হইয়া তাহার বিকাশ বা উদ্ভব হয়। এইরূপ পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতের সূক্ষ্ম ভাবে চৈতন্য থাকার প্রমাণ নাই। (ভিঃ)

ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভূত সকলের সংঘাতরূপ দেহে চৈতন্য আছে বলিয়া প্রত্যেক ভূতে বা অণুতে সূক্ষ্ম রূপে সেই চৈতন্য শক্তি থাকা অনুমান হইতে পারে।

ইহাতে দোষ এই যে, তাহা হইলে অনেক ভূতে অনেক চৈতন্যের কল্পনা করিতে হয়।

যদি বলা যায় যে, অবয়বে যে গুণ নাই, অবয়বীতে তাহা দেখা যায়, (যেমন ঘটি) তাহাও সঙ্গত নহে। সজাতীয় কারণ জন্য যে গুণ, তাহা অবয়ব ও অবয়বী উভয়েই থাকে। (বিঃ ভিঃ)

২৩। জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

একস্থূল দেহ হইতে দেহান্তরে লিঙ্গ শরীরের সঞ্চার হয়। লিঙ্গ শরীরে স্থূলদেহের সঞ্চারই জন্ম। পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই লিঙ্গ-শরীর স্থূল শরীর গ্রহণ করে। মুক্তিই পরম পুরুষার্থ। তাহার জন্যও এই জন্মগ্রহণের প্রয়োজন। তাহা দ্বারা কিরূপে এই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। এই জন্মদ্বারাই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। এবং বিবেক বা প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতেই মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। জ্ঞানাদি প্রত্যয়সর্গ। যথা—"এষ প্রত্যয় সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ।" (কারিকা)। এই বুদ্ধিরূপ সর্গের প্রয়োজন এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ) জীবের প্রথম প্রথম জন্মে তাহাদের হেয় কর্ম্মানুযায়ী সংস্কার বন্ধনহেতু লিঙ্গ শরীরের বিশেষতঃ অন্তঃকরণের বিশেষ বিকাশ হয় না। নানা জন্মগ্রহণ দ্বারা যখন প্রকৃতির ক্রম আপূরণে জাত্যন্তর হইতে থাকে, ততই অন্তঃকরণের বিকাশ হয়। বুদ্ধিই প্রধান-তত্ত্ব, ইহা শেষে বোধ হয় মনুষ্যযোনিতে বিকাশ হয়। এই বুদ্ধি যখন সাত্ত্বিক অধ্যবসায়াত্মক হয়, তখন তাহার স্বরূপ—জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। এই জ্ঞানের স্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান, বেদান্ত মতে আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের বিকাশেই মুক্তি হয়।

২৪। আর বিপর্য্যয় হইতে বন্ধন হয়।

বিপর্য্যয় অর্থে জ্ঞান, অজ্ঞান। বিপর্য্যয় কাহাকে বলে, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে।

বন্ধন ও মোক্ষ এই উভয়ই লিঙ্গ শরীরের স্থূল-শরীরে সঞ্চার হইতে হয়।

বন্ধন সুখ দুঃখাত্মক।

২৫। নিয়ত কারণ হেতু, তাহার সমুচ্চয় বা বিকল্প নাই।

কেহ কেহ বলেন, কেবল জ্ঞানেই মুক্তি হয় না—কর্ম্ম ও তাহার সাধন। শ্রুতিতে আছে, "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্ব প্রজ্ঞাচ।" ইহারই উত্তরে এই সূত্র।

জ্ঞানই মুক্তির নিয়ত কারণ, এজন্য তাহার সহিত কর্ম্মের বা অন্য কিছুর সমুচ্চয় সংযোগ অর্থাৎ একত্র সাধন বা বিকল্প নাই।

কর্ম্ম মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। অথবা কর্ম্ম সহিত জ্ঞানও মুক্তির কারণ নহে। জ্ঞানই কেবল সাক্ষাৎ কারণ। কর্ম্ম গৌণ কারণ মাত্র। তাহাতে বিশেষতঃ নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে। শ্রুতিতে আছে,—

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (অণিঃ)

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদোভয়ং সহ" ইতি শ্রুতিঃ। এই শ্রুতি থাকিলেও, অবিদ্যা নিবৃত্তিই জ্ঞানের নিয়ত কারণ। কর্ম্মই অবিদ্যা; অবিদ্যাখ্য কর্ম্মের সহিত, এজন্য জ্ঞানের মোক্ষ জননে সমুচ্চয় বা বিকল্প নাই। কর্ম্ম সাক্ষাৎ মুক্তি হেতু হইতে পারে না। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির অন্য উপায় নাই। শ্রুতিতে আছে, "তমেব বিদিত্বা · " ইত্যাদি।

আরও আছে, "ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বম্ অনশু । (বিঃ ভিঃ)।

২৬। যাহা স্বপ্নের তুল্য মায়িক বা মিথ্যা ও যাহা জাগরণের তুল্য অমায়িক বা সত্য, উভয়েই পুরুষের মুক্তির কারণ হইতে পারে না।

যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ তুল্যাকারীয় নহে বলিয়া তাহার সমুচ্চয় হয় না, সেইরূপ জাগরণবৎ জ্ঞানও স্বপ্নবৎ কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। (অণিঃ)

কর্ম্ম—মায়িক, জ্ঞান—অমায়িক। জাগ্রৎ পদার্থ—স্বপ্নাপেক্ষা সত্য। কর্ম্ম, অস্থির ও প্রকৃতির কার্য্য। জ্ঞান তাহা নহে। যেমন জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়ের যুগপৎ মিলন হয় না, তেমনই অসত্য ও সত্যের মিলন হয় না।

মায়িক = অসত্য, অবিদ্যা। অমায়িক = সত্য, বিদ্যা। উভয় মিলনে একবিধ ফল সম্ভব নহে। বিদ্যা ও অবিদ্যার মিলনে মোক্ষ হয় না। তজন্য কেবল জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। (বিঃ ভিঃ)

ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে। অমায়িক বিদ্যা, মায়িক অবিদ্যা, অবিদ্যা বা বিদ্যা কেহই মুক্তির কারণ নহে। ঈশোপনিষদে আছে "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাগতে। ততো ভূয়ঃ এব তমোয় উ বিদ্যায়াং রতাঃ। যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহা এ উভয়ের অতীত, তাহা জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধি স্বচ্ছ জ্ঞানরূপ হয়, সেই জ্ঞানই মুক্তির কারণ। সে জ্ঞান মায়িক, অমায়িক-স্বপ্ন জাগরিত অবস্থার অতীত, নিদ্রাবস্থার অতীত জ্ঞানে তুরীয় অবস্থা। তাহা সমাধিস্থ প্রজ্ঞা।

২৭। অপর (অর্থাৎ মায়িক স্বপ্ন) অত্যন্ত মিথ্যা নহে।

জ্ঞান ব্যতীত অপর মুক্তির উপায়ও, যাহাকে স্বপ্ন প্রত্যয়ের সহিত তুলনা করা হইল, একেবারে মিথ্যা নহে।

তাহা ত আকাশকুসুমের মত অত্যন্ত মিথ্যা নহে। তেমনই কর্ম্মও একেবারে মিথ্যা নহে। (অণিঃ)।

আত্মার উপাসনা রূপ জ্ঞানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের উক্তরূপ সমুচ্চয় ও বিকল্প সম্ভব, কেন না যিনি উপাস্য, তিনি মায়িক নহেন। এইজন্য এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

"ইতরের অর্থাৎ উপাস্যের—অত্যন্ত অমায়িকত্ব নাই, কেন না উপাস্যে আত্মাতে অধ্যস্ত পদার্থের প্রবেশ হয়।" (বিঃ ভিঃ)।

সাধারণতঃ মুক্তির তিনটী উপায় উক্ত হয়,—জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা (ভক্তি), সাংখ্য মতে 'জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। অপর উপায় একেবারে নিরর্থক নহে। তাহারা সহকারী কারণ মাত্র।

২৮। সঙ্কল্পিত ব্যাপার এইরূপ।

আমাদের সঙ্কল্প মাত্রেই সিদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু সংকল্পিত বিষয়ও একেবারে মিথ্যা নহে। আমাদের সংকল্প মিথ্যা হইলেও যোগীর সংকল্প মিথ্যা নহে।

বিজ্ঞানভিক্ষু এই শ্লোক ও পূর্ব্ব শ্লোক সম্বন্ধে বলেন যে, কেবল জ্ঞানেই মুক্তি হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের যে একেবারে প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম যে একেবারে সাধক বা মিথ্যা, তাহা নহে। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম। সেখানে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিকাশ হয়। আর যে উপাসনা কর্ম্ম, তাহার সহিতও জ্ঞানের বিকাশ ও অভ্যুদয় হয়। এই উপাসনা কর্ম্মের মধ্যে সত্যাংশ উপাস্য আত্মায় অধ্যস্ত পদার্থের প্রবেশ কথা ইহার ২৭ সূত্রে উক্ত হইয়াছে। আর উপাসনার মধ্যে, মিথ্যাংশ সংকল্প। মনঃসংকল্পিত ধ্যেয় অংশে ইহা মায়িক বা মিথ্যা। যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার প্রপঞ্চ অংশ মায়িক আর ব্রহ্ম অংশ সত্য।

২৯। ভাবনার উপচয় দ্বারা যে শুদ্ধ হয়, তাহার সকলই প্রকৃতিবৎ হয়।

যোগজ ধর্ম্ম প্রভাবে যোগীর সকল সংকল্পই সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি হইতে যেরূপ মহত্ত্বাদির উৎপত্তির জন্য কারণান্তরের অপেক্ষা নাই, যোগীর সংকল্প সিদ্ধি সম্বন্ধেও সেইরূপ। কেবল ভাবনা দ্বারাই যোগিগণের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। (অণিঃ)

পরমাত্মা ভাবনা রূপ উপাসনা দ্বারা পুরুষ শুদ্ধ হইলে, প্রকৃতির ন্যায় তাহার সকল ঐশ্বর্য্য হয় আত্ম চিন্তা দ্বারা তাহার পাপ বিনষ্ট হইলে, তাহার বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকৃতির প্রেষবশে সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা হইতে পারে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী। (বিভিঃ)

৩০। রাগ উপহিত হইলে ধ্যান সিদ্ধি হয়।

রাগ = রজোগুণজ চাঞ্চল্য। বিষয়াভিমুখে চিত্তের সেই চাঞ্চল্য দূর হইলেই ধ্যান সিদ্ধি হয়। উক্ত ভাবনা ধ্যান হইতে জন্মে (অণিঃ)।

বিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তি হইলেই আত্মধ্যান সম্ভব হয়। আত্মতত্ত্ব চিন্তায় বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হয়। সুতরাং আত্ম-ধ্যানই জ্ঞানের কারণ। কার্য্য কারণ এক, এজন্য, রাগ ক্ষয়ই ধ্যান।

ধ্যান = ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ইহাই জ্ঞানের প্রধান সাধন। অষ্টাঙ্গ যোগ বিবরণ

পাতঞ্জল-দর্শনে আছে। এস্থলে তাহার শেষ পঞ্চাঙ্গ মাত্র বিবৃত হইবে। বিঃ ভিঃ।

৩১। বৃত্তি নিরোধ হইতে তাহার সিদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে ২।৩০ সূত্রে বৃত্তি কি বুঝান হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি, নিদ্রা। এই বৃত্তি নিরোধে ধ্যান সিদ্ধ হয়।

"যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ"—ইতি পাতঞ্জল দর্শন।

কেবল ধ্যানের আরম্ভেই মুক্তি হয় না। ধ্যান নিষ্পত্তির দ্বারাই ধ্যেয়াতিরিক্ত বিষয়ে বুদ্ধির নিবৃত্তি হয়। তখন ধ্যেয় সাক্ষাৎকার হয়। তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এই জন্য যোগ, ধ্যানাদির জ্ঞানের কারণ। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রুতিতে আছে—

"অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং—
মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি"।

(বিঃ ভিঃ)

৩২। ধারণা, আসন ও স্বকার্য্য দ্বারা তাহা সিদ্ধি হয়।

ধারণাদি সাধন দ্বারা নিরোধশক্তি জন্মে। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। স্বকার্য্য এস্থলে ক্রিয়া যোগ। ধারণাদি পর সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩৩। ছর্দ্দি ও বিধারণ দ্বারা নিরোধ সিদ্ধি হয়।

ছর্দ্দি বা প্রচ্ছর্দ্দন = রেচক = শ্বাস ত্যাগ। বিধারণ = কুম্ভক নিঃশ্বাস রোধ। ইহা হইতে নিরোধ সিদ্ধ হয়।

'প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য'—পাতঞ্জল দর্শন। এ স্থলে রেচক পূরক কুম্ভক—প্রাণায়ামের এই তিন অঙ্গই উপলক্ষিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, প্রাণায়াম নিরোধের অন্য উপায় নহে—ইহা ধারণার লক্ষণ।

ধারণার অর্থ—নাভি প্রভৃতি দেশে চিত্তের ধারণা। যম নিয়ম প্রাণায়াম প্রত্যাহার উক্ত ৩২ সূত্রে স্বতন্ত্র রূপে উক্ত হয় নাই। আসনের পূর্ব্বে তাহা অঙ্গিকৃত হইয়াছে, ধরিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রাণায়াম নিরোধের প্রধান উপায় বলিয়া এস্থলে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ও স্বকর্ম্ম দ্বারা যম, নিয়ম, প্রত্যাহার অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

৩৪। আসন স্থির ও সুখজনক।

যেরূপ ভাবে অবস্থানে শরীরের স্পন্দনাদি নিবৃত্তি হইয়া শরীর স্থির হয়, ও সুখানুভব হয়, তাহাই যোগের আসন।

আসন ৬৪ প্রকার। তন্মধ্যে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিক আসনাদি শ্রেষ্ঠ।

৩৫। নিজ আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই স্বকর্ম্ম।

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু,—এই চারি আশ্রম আছে। এই আশ্রম বিহিত কর্ম্মই স্বকার্য্য। তাহা দ্বারাই যম নিয়ম প্রত্যাহার সাধিত হয়, ইহা সর্ব্বাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম।

৩৬। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—যাহারা মুখ্যাধিকারী, তাহাদিগের পক্ষে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—যোগের এই পাঁচ বহিরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন নাই। কেবল

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই ত্রিবিধ সংযম দ্বারাই জ্ঞান ও যোগ সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের সিদ্ধান্ত।

পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পাদের "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ"—"এই সূত্র ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অতএব যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহারা কেবল বৈরাগ্য সহিত ধ্যানরূপ অভ্যাস হইতেই জ্ঞান ও জ্ঞান, সাধন যোগে সিদ্ধ হয়। তাহাদের যম নিয়মাদি অন্য যোগের প্রয়োজন নাই। গারুড় পুরাণে আছে—

"আসন স্থানবিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকাঃ।
বিলম্বজননাঃ সর্ব্বে বিস্তরা পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

গীতায় আছে, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। ধ্যান তাহার সাধন। ধ্যান দ্বারাই আত্ম দর্শন রূপ জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। এজন্য এস্থলে সেই জ্ঞান সাধন যে ধ্যান বা সমাধি, তাহা বিবৃত হইল। এই যোগের যাহা অন্তরায়, তাহা উক্ত হইতেছে।

৩৭। বিপর্য্যয় ভেদ পাঁচ প্রকার।

পূর্ব্বে বিপর্য্যয়কে (বিপরীত জ্ঞানকে) বন্ধের কারণ বলা হইয়াছে। সেই বিপর্য্যয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, হতাই পাতঞ্জল মতে পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়—ইহারা অবিদ্যা-মূলক। অনিত্য বস্তুতে নিত্য জ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখ বোধ বা সুখে দুঃখ বোধ অবিদ্যা। **অস্মিতা, অহং বুদ্ধি—শরীরে আত্মজ্ঞান।** রাগ বিষয়ে অনুরাগ। দ্বেষ, বিষয় বিদ্বেষে বিশেষ। অভিনিবেশ = মরণ ভয়। (পাতঞ্জল সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

৩৮। অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার।

মন ও ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই ১১ ইন্দ্রিয়ের দোষ ১১ ও বুদ্ধির দোষ ১৭, এই ২৮ অশক্তি। অশক্তি বিপর্য্যয়ের কারণ। কারিকায় আছে —

"একাদশেন্দ্রিয় বধাৎ সহ বুদ্ধি বধৈরশক্তি-রুদ্দিষ্টা।"

সপ্তদশ বধা বুদ্ধে বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টি সিদ্ধিনাম্।"

অন্যত্র আছে,—

বাধির্য্যং ক্ষপিতান্ধত্বং জড়তা জিহ্বতা তথা।
মূকতা কোণ্য পঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমুগ্ধতা॥"

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি। আর নয় তুষ্টির বিপর্য্যয়ে নয় অশক্তি, ও ৮ সিদ্ধির বিপর্য্যয়ে ৮ অশক্তি,—এই ১৭ বুদ্ধির অশক্তি।

৩৯। তুষ্টি নয় প্রকার।

এই নয় প্রকার তুষ্টি পরে বিবৃত হইয়াছে।

৪০। সিদ্ধি অষ্ট প্রকার।

পঞ্চ সিদ্ধির কথাও পরে উক্ত হইয়াছে।

৪১। বিপর্য্যয়ের পূর্ব্ববৎ অবান্তর ভেদ আছে।

অর্থাৎ এই বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার হইলেও তাহার অনেক অবান্তর ভেদ আছে। কারিকায় এই পাঁচ বিপর্য্যয় ভেদ অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে, যথা,—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। ইহার মধ্যে তমঃ ৮ প্রকার, মহামোহ ১০ প্রকার, তামিস্র ১৮ প্রকার ও অন্ধতামিস্র ১৮ প্রকার। ইহা মূল অবিদ্যারই অবান্তর ভেদ।

এই অবান্তর ভেদ—৬২ প্রকার। যথা; (১) **প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইহাতে আত্মবুদ্ধি রূপ অবিদ্যা—এই অষ্ট প্রকার হইতে তমঃ ৮ প্রকার।**

(২) দেবতাদের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে যে

আত্মভাব, তাহা হইতে অস্মিতা = ৮ প্রকার। অথবা অবিদ্যার ন্যায় এই ভেদ আট প্রকার।

(৩) দিব্য পঞ্চতন্মাত্র, ও আদিব্য পঞ্চতন্মাত্র এই ১০ বিষয়ে যে অনুরাগ, তাহা মহামোহ, তাহা দশ প্রকার।

(৪) শব্দাদি ১০, ও অণিমাদি ৮, এই ১৮ বিষয়ে অন্যের দ্বারা উপহত হইলে যে দ্বেষ তাহা তমিস্রা। তাহা ১৮ প্রকার।

(৫) এই ১৮ বিষয় উপহত বা বিনাশ হইবার ত্রাস বা অভিনিবেশ = অন্ধতামিস্রা, ইহা ১৮ প্রকার।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে বিপর্য্যয়ের অবান্তর ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন ও যাহা কারিকায় আছে, তাহা এস্থলে বিস্তারিত হয় নাই। (বিঃ ভিঃ ও অণিঃ)।

৪২। অপরের ভেদও এইরূপ।

অপরের অর্থাৎ অশক্তির। অশক্তির ২৮ ভেদ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (কেহ বলেন, ইহাও পূর্ব্বোক্ত সূত্র অনুসারে ৬২ প্রকার।)

৪৩। আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার

অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত যে তুষ্টি, তাহা আধ্যাত্মিক—তাহা চারি প্রকার। আর বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। আধ্যাত্মিক তুষ্টি এই—

(১) কেবল প্রকৃতির উপাসনায় প্রকৃতি বিবেক হইবে ও তাহাতেই মুক্তি হইবে। ইহা অম্ভ নামক তুষ্টি। (ইহা প্রাকৃতিক)। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মাকে ভাবনা দ্বারা যে বুদ্ধি—তাহাই প্রাকৃতিক তুষ্টি।

(২) এ বিবেকেও প্রয়োজন নাই। কেবল ব্রতাদি গ্রহণেই সিদ্ধি হইবে। ইহা সলিল নামক তুষ্টি। ইহাকে ঔপাদানিক তুষ্টি বলে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, কেবল প্রব্রজ্যারূপ উপাদানে এই তুষ্টি হয়।

(৩) **কেবল কালেই সিদ্ধি হইবে।** এই ভাবিয়া অপেক্ষা করায় যে তুষ্টি—ইহা ওঘ নামক তুষ্টি। (ইহাকে কালিক তুষ্টি বলে)।

(৪) কাল বশেও নহে—কেবল ভাগ্য বলেই সিদ্ধি হইবে। ইহা বৃষ্টি নামক তুষ্টি। ইহাকে ভাগ্যাধীন তুষ্টি বলে।

এই চারি প্রকার তুষ্টি আন্তরিক বলিয়া ইহাদের আধ্যাত্মিক তুষ্টি বলে। বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার, যথা,—

(১) **বিষয় অর্জ্জনে দুঃখ দেখিয়া বিষয়ে** যে বৈরাগ্য, তাহা পার নামক তুষ্টি।

(২) বিষয় রক্ষণ দুঃখকর বলিয়া তাহা ত্যাগ—সুপার তুষ্টি।

(৩) **বিষয় ক্ষয়শীল বলিয়াও তাহার ক্ষয়ে দুঃখ হবে ভাবিয়া যে বিষয় ত্যাগ**—তাহা পারপার তুষ্টি।

(৪) ভোগদোষ ভাবিয়া বিষয় হইতে উপরতি—অনুত্তমাম্ভ তুষ্টি।

(৫) বিষয় ত্যাগ ব্যতীত যোগ সিদ্ধ হয় না, বিষয় সম্পর্কে হিংসাদি দোষ ঘটে, এজন্য যে ত্যাগ, তাহা উত্তমাম্ভ তুষ্টি।

এইরূপ আধ্যাত্মিকও পাঁচ বাহ্য তুষ্টি সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার তুষ্টি। (অণিঃ)।

কারিকায় আছে—

"আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্য বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ॥"

যে তুষ্টি সন্তোষবান্ ব্যক্তির আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, তাহা আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

(১) চিত্ত ব্যাপার প্রকৃতির—আমি কূটস্থ,

এইরূপ আত্মভাবনা হেতু তুষ্টি—প্রাকৃতিক।

(২) প্রব্রজ্যা হইতে তুষ্টি—ঔপাদানিক।

(৩) তাহার পর সমাধি অনুষ্ঠান হইতে তুষ্টি কালিক।

(৪) প্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় যে ধর্ম্ম মেঘ সমাধি হয়, সেই পরম তুষ্টি ভাগ্যাধীন।

(৫—৯) শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে উপার্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদি দোষ দৃষ্টিতে বিরাগ হইলে বাহ্য তুষ্টি হয়। (বিঃ ভিঃ)।

কোন কোন টীকাকার কারিকায় উক্ত সূত্রের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন, যথা—বিবেক প্রকৃতিরই পরিণাম তাহার জন্য ধ্যানাভ্যাস বৃথা। এই জ্ঞানে ধ্যান হইতে নিবৃত্তি, যে তাহা প্রাকৃতিক তুষ্টি। প্রব্রজ্যাতে মুক্তি হইবে, এই ধারণা—দ্বিতীয় তুষ্টি। সন্ন্যাসীর কালান্তরে মুক্তি হইবে, ইহা তৃতীয় তুষ্টি। ভাগ্যবশতঃ মোক্ষ হইবে, এ ধারণা ভাগ্যাধীন তুষ্টি।

এই তুষ্টি জ্ঞানের সাধক। ইহার অভাবে জ্ঞান ও যোগের বিঘ্ন হয়। বিপর্য্যয় থাকে। অতএব এ অর্থ সঙ্গত নহে। (বঃ ভিঃ)

৪৪। ঊহাদিভেদে সিদ্ধি আট প্রকার।

এই অষ্ট সিদ্ধির নাম,—তার, সুতার, তারতার, রম্য, সদামুদিত, প্রমোদ মুদিত ও মোদমান।

(১) ঊহ বা তর্ক মনন সিদ্ধি = তার।

(২) শব্দজ্ঞান লাভ সিদ্ধি = সুতার।

(৩) অধ্যয়ন সিদ্ধি = তারতার।

(৪) সদ্‌গুরু প্রাপ্তি = রম্য।

(৫) বাহ্যান্তর শুদ্ধি = সদামুদিত।

(৬) আধ্যাত্মিক দুঃখ বিঘাত = প্রমোদ।

(৭) আধিভৌতিক দুঃখ বিঘাত = মুদিত।

(৮) আধিদৈবিক দুঃখ শান্তি = মোদমান।

বিপর্য্যয়, অশক্তি তুষ্টি, সিদ্ধি,—ইহাদের অবান্তর ভেদ ৫০ (বিপর্য্যয় ৫, অশক্তি ১৮, তুষ্টি ৯ ও সিদ্ধি ৮)। ইহাদের মধ্যে পরপর দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগ করিলে পশ্চাৎ সিদ্ধি হয়। (অণিঃ)।

কারিকায় আছে—

ঊহ শব্দোধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃদপ্রাপ্তি।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বাঙ্কুশ স্ত্রিবিধঃ।

ইহার মধ্যে শেষ ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাতই মুখ্য—অন্য পাঁচটী তাহার সাধক।

(১) উপদেশাদি ব্যতিরেকে পূর্ব্বভাবী অভ্যাস বশতঃ যে সিদ্ধি—তাহা ঊহ সিদ্ধ।

(২) শ্রবণ বা শাস্ত্রালোচনা করিয়া যে জ্ঞান লাভ—তাহা শব্দ সিদ্ধি।

(৩) সৎ আচার্য্যের শিষ্য হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ফলে যে সিদ্ধি, তাহা অধ্যয়ন সিদ্ধি।

(৪) পরম কারুণিক আচার্য্য স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইয়া যে উপদেশ প্রদান করেন—তাহাতে যে সিদ্ধি,তাহা সুহৃদ্ প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি।

(৫) ধনাদি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া যে জ্ঞান লাভ, তাহা দান সিদ্ধি।

(৫।৬।৭) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ সিদ্ধি হয়, এই মুখ্য সিদ্ধি।

ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুখ্য সিদ্ধির আকর্ষক বা অঙ্কুশ। (বিঃ ভিঃ)।

৪৫। একের হান ব্যতীত অপর হইতে সিদ্ধি হয় না।

অশক্তি হইতে বিপর্য্যয় হান্ বা নাশ না হইলে সিদ্ধি হয় না। তুষ্টি হইতে অশক্তির বিঘাত না হইলে ও সিদ্ধি হইতে তুষ্টির হান্ না হইলে—সিদ্ধি হয় না। (অণিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করেন, ইতর হানি, অর্থাৎ বিপর্য্যযাদির হানি ব্যতীত, ইতর হইতে, অর্থাৎ উহাদি ভিন্ন মন্ত্র বা তপঃ সমাধি হইতে প্রকৃত সিদ্ধি লাভ হয় না। অর্থাৎ উহাদি পঞ্চ কারণ ভিন্ন অন্য কারণে অর্থাৎ মন্ত্র ঔষধি, তপস্যা, সমাধি প্রভৃতি কারণে অণিমাদি নিম্ন সিদ্ধি হইলেও তাহাতে প্রকৃত সিদ্ধি হয় না। কারণ সংসার বন্ধনের কারণ পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়, সেই বিপর্য্যয়ের নিবৃত্তি না হইলে প্রকৃত সিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা সিদ্ধির আভাস মাত্র।

যোগ সূত্রে আছে, সমাধিকালে ইহারা উপসর্গ, ব্যুত্থান কালেই সিদ্ধি। সংসার নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হয়। জ্ঞান হইতেই সে মোক্ষ হয়। বুদ্ধির গুণরূপ সমষ্টি সৃষ্টি রূপ স্বকার্য্যের সহিত পুরুষ বদ্ধ। বীজাঙ্কুরের ন্যায় বুদ্ধি ও তাহার গুণ সম্বন্ধ।

কারিকায় আছে—

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাব-
নিবৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে
সর্গঃ।

ভাব = বাসনারূপ বুদ্ধি। জ্ঞানাদি গুণ সকল।
লিঙ্গ = মহত্তত্ত্ব রূপ বুদ্ধি। অতএব সৃষ্টি
দুইরূপ।
লিঙ্গাখ্য ও বাসনাখ্য বা ভাবাখ্য।
(বিঃ ভিঃ)।

৪৬। দৈবাদি প্রভেদ আছে।

সৃষ্টি দৈবাদিভেদে ছয় প্রকার। যথা—

"দৈবাদি ষড় বিধশ্চ স্যাৎ সংসারঃ কর্ম্ম সম্ভব।"

দেব, অসুর, নর, নারকী, তির্য্যক ও স্থাবর—এই ছয় প্রকার সৃষ্টি (অণিঃ)

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, সৃষ্টি সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভেদে দুই প্রকার। প্রকৃতি হইতে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে সমষ্টি, সৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যষ্টি বা বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে। অথবা কর্ম্মবিশেষ হইতে ব্যক্তিভেদ বিস্তারিত হইতেছে।

কারিকায় আছে—

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যক যোনশ্চ পঞ্চধা
ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ
সর্গঃ॥"

(১) ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ—এই অষ্টবিধ দৈব সৃষ্টি।

(২) পশু, মৃগ, পক্ষী সরীসৃপ ও স্থাবর, এই পাঁচ তির্য্যক যোনি সৃষ্টি।

(৩) মানুষ = একবিধ।

বিরাট পুরুষ হইতে এই ভৌতিক ভূত-গণের বা ব্যষ্টি প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়।

৪৭। ব্রহ্ম অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি সেই পুরুষের নিমিত্ত। তাহা বিবেক জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে।

যাবৎ বিবেক জ্ঞান না হয়, তাবৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় সৃষ্টি থাকে।

স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যষ্টি সৃষ্টি বিরাট সৃষ্টির ন্যায় পুরুষার্থ ই হয়। ও পুরু-ষের বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত থাকে। (বিঃ ভিঃ)

৪৮। ঊর্দ্ধ (লোক) সত্ত্ববিশাল।

ঊর্দ্ধ দেবলোক সত্ত্ব বিশাল। সেখানে সত্ত্বের আধিক্য। ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ভূলোকের উপর। দেবলোকের সৃষ্টি সাত্ত্বিক।

৪৯। মূল হইতে তমো বিশাল।

মূলে—অর্থাৎ পাতালে, নাগলোকে।

ভূলোকের অধোভাগে। সেখানে জীব তমো বহুল।

৫০। মধ্য রজোবিশাল।

মধ্য—অর্থাৎ পৃথিবী লোক ভূলোকে। পৃথিবীতে জীব রজো বহুল।

৫১। কর্ম্মের বিচিত্রতা হইতে গর্ভদাসের ন্যায় প্রধান চেষ্টা করে।

গর্ভদাস বা জন্ম হইতেই যাহার দাসত্ব, সেই বুদ্ধিমান ভৃত্য যেমন প্রভুর তুষ্টির জন্য বিচিত্র কর্ম্ম করে, তেমনি প্রধান ও কর্ম্ম-বৈষিত্র্য হেতু সৃষ্টি পুরুষের জন্য বিচিত্র করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"কর্ম্ম বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্রম্"। পুরুষের কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ।

বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নিমিত্ত, একই প্রকৃতির নানা প্রকার চেষ্টা হয়। প্রকৃতি দ্বারা নানা প্রকার ভোগ্য বিষয় ভোগ যোগ্য শরীর সৃষ্টি হয়। এজন্য উদ্ধাধঃ দেবাদি লোকের সৃষ্টি।

প্রভুর নানারূপ প্রয়োজন। যে বুদ্ধিমান্ ভৃত্য আজন্ম সেই প্রভুগৃহে পরিপালিত হইয়াছে, সে কোন্ সময় প্রভুর কোন্ প্রয়োজন হইবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে, ও তদনুসারে নানারূপ কার্য্য করিয়া প্রভুর প্রয়োজন সিদ্ধি করে। প্রকৃতিও পুরুষের ভৃত্যের ন্যায় সেইরূপ করে।

সৃষ্টি অনাদি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির কর্ম্ম হইতে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্ট যে পুরুষ সঞ্চয় করে, তদনুসারে পরসৃষ্টিতে তাহার ভোগের উপকরণ প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বদ্ধ পুরুষের কর্ম্ম বীজ পৃথক্, এজন্য প্রত্যেক পুরুষের জন্য প্রকৃতির পৃথক্ রূপ ভোগের আয়োজনের প্রয়োজন হয়। বদ্ধ পুরুষের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে আছে। পুরুষের দাসের ন্যায় প্রকৃতি কার্য্য করে।

এজন্য প্রত্যেক বদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন সাধন জন্য প্রকৃতি নানারূপ সৃষ্টি করে।

৫২। তাহাতে উত্তরোত্তর যোনি যোগে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেও হয়, তাহা হেয়।

কর্ম্ম বলে শ্রেষ্ঠ বা ঊর্দ্ধ লোক লাভ হইলেও তাহা হেয়, কেন না কর্ম্ম ক্ষয়ে তথা হইতে আবার যোনিযোগে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়।

ঊর্দ্ধ স্বর্গ লোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন হয়। এবং উত্তরোত্তর যোনি যোগে ক্রমে অধঃ হইতে অধঃতর লোকে পতিত হইতে হয়। এজন্য এ সংসার হেয় মোক্ষই প্রয়োজন।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন কথা।

প্রত্যাবর্ত্তন।

টিফ্লিস নগরে জেলিহোবাস্কির শ্বশুরালয়ে আজ মহাধুম। তাঁহার শ্বশুর কন্যার বিবাহ। বিবাহোৎসবে যোগদানার্থ সমাগত সম্ভ্রান্ত অতিথিগণে গৃহ পূর্ণ। অবিরত অশ্ব ও শকটের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের আগমনে এবং লোকজনের গতায়াতে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত। ক্রমাগত বহির্দ্বার ঘণ্টা ঠুং ঠুং শব্দে অতিথির আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, অমনি পরিচারকগণ

দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অতিথিকে সসম্মানে গৃহ-মধ্যে লইয়া আসিতেছে। নিমন্ত্রিতগণ আহারে উপবিষ্ট। তৎপর দেশীয় প্রথানুসারে বরপক্ষীয় অভ্যাগত ব্যক্তিগণ পান পাত্র হস্তে নবদম্পতির শুভ কামনায় আশীর্ব্বচন প্রয়োগার্থ দণ্ডায়মান। রুষিয়ার বিবাহ পর্ব্বে ইহা একটী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মহাক্ষণ। এমন সময়ে আবার কে ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিল। এ আগন্তুক কে? জেলিহোবাস্কি বলিতেছেন—"কে যেন বড়ই অধীরতার সহিত ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কি যেন একটা অনিবার্য্য শক্তিতে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। আমি আবেগ-বশে ভোজন-পাত্র পরিত্যাগ করিয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলাম। গৃহে দাস দাসী থাকা সত্ত্বেও আমি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, কাহাকেও না বলিয়া, স্বয়ং সবেগে দ্বার খুলিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কি জানি কেন বলিতে পারি না, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমার সেই বহুকাল প্রবাসিনী ভগ্নি বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে।" জেলিহোবাস্কির ধারণা মিথ্যা হইল না। তিনি প্রিয়তমা ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতা কর্ণেলহ্যান ও নিমন্ত্রিত মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে ব্লাভাস্কী আত্মীয়বর্গের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তিনি কিছু দিন ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন, পরে ১৮৫৮ খ্রীঃ টিফ্লেস নগরে উপস্থিত হইলেন।

ব্লাভাস্কী গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্র, অনেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল, তন্মধ্যে যে গুলি জেলিহোবাস্কী স্বয়ং স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া তৎকৃত "পারিবারিক স্মৃতি-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। গ্রন্থাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে, এই সকল বিবরণ রুষিয়ার তাৎকালীন কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ-মালায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্লাভাস্কী যে রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, সেই রাত্রের ঘটনা এই। তাঁহার আগমনের মুহূর্ত্ত হইতে গৃহে এক প্রকার "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ এবং "চুপি চুপি" কথাবার্ত্তার অস্পষ্ট ধ্বনি অনবরত শুনা যাইতে লাগিল। কেহই ইহার কারণ খুঁজিয়া পান না, কেহই ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন না। তিনি যে স্থানে বসিয়া থাকিতেন বা যাইতেন, শুধু সেই খানেই এইরূপ হইতেছিল, তাহা নহে, অন্যান্য প্রকোষ্ঠেও ঐ "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ এবং গৃহ সামগ্রীর সঞ্চালন-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। প্রাচীর গাত্রে, গৃহের ভিত্তিতে, বাতায়ন পার্শ্বে, শয্যাতলে, বসিবার আসনে, দর্পণ সান্নিধ্যে, ঘড়ির উপরে,—এক কথায় গৃহের ছোট বড় প্রত্যেক দ্রব্যে অবিরত এই "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকলে সচকিতে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না। ব্লাভাস্কীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু তিনি ইহা লইয়া যেন একটু আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অথচ ইহার মূলে যে কোন গূঢ় শক্তি রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে, জেলিহোবাস্কীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে তিনি বলিলেন, কি বাল্যে কি যৌবনে, তিনি যেখানেই যাইতেন, এই সকল ব্যাপার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া মাত্র। ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে এইরূপ শব্দাদির হ্রাস বৃদ্ধি সুসাধ্য, এবং উহা একেবারে বন্ধ করাও যাইতে পারে। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যদ্বারা স্বীয় উক্তি সপ্রমাণ করিলেন। ইয়ুরোপে তখন সবে প্রেততত্ত্ব অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। প্রেতবাদিগণ এই সকল কার্য্য মিডিয়মের সাহায্যকৃত বা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু সরল টিফ্লিসবাসীগণ তখনও প্রেততত্ত্বাদিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাঁহারা কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তবে প্রেতবাদীগণ যাহাই বলুন, ইহাতে যে ভূত সঞ্চারের লেশ মাত্রও ছিল না, ইহা ব্লাভাস্কী পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, যে শক্তি বলেই হউক, তাঁহার আগমনাবধি এই সকল ব্যাপার সর্ব্বসমক্ষে অনবরত ঘটিতে লাগিল। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী আত্মীয় পর সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বিদ্যুৎবেগে এই সকল কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এবং ইহা লইয়া সমগ্র সহরটা আন্দোলিত হইতে লাগিল। বস্তুত পূর্ব্বোক্ত শব্দ শুধুই জড় বস্তুর আঘাত-জনিত নহে, উহার মূলে চৈতন্য ও জ্ঞান-শক্তি নিহিত ছিল। যাঁহারা ইহার সত্যাসত্য জানিতে ইচ্ছুক হইতেন, শব্দ তাহাদের জীবনের ভূত ভবিষৎ ব্যক্ত করিয়া দিয়া সন্দেহ দূর করিয়া দিত। শুধু তাহাই নয়, মানুষের অন্তঃকরণের লুক্কায়িত, গুপ্ত ভাব ও চিন্তাগুলিও এই শব্দের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কত লোকের ভূত জীবনের কার্য্য এবং মনের বর্ত্তমান গুপ্ত বাসনা এইরূপে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিপদী বা টেবিলের পদদ্বারা ঘরের মেজের উপর আঘাত-জনিত যে শব্দ হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা নানা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, ইহা আজকাল এদেশে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে যতই অজ্ঞতা বা সন্দেহ থাকুক, ঐরূপ চৈতন্যমূলক শব্দাভিঘাত যে সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক বা দৃষ্ট-শক্তি সম্পর্ক-রহিত, ইহাতে আজ কাল বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা হইতে উপরোক্ত বিবরণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপদী বা টেবিল-ঘটিত ব্যাপারে অনুষ্ঠাতাগণের হস্ত-সংস্পর্শ থাকে, এবং উহাদের মধ্যে কখনও কেহ বা মিডিয়ম হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্লাভাস্কীর অনুষ্ঠিত কার্য্যে নিজের বা অপর কাহারও কোন বস্তুর সহিত হস্তসংস্পর্শ কিছুমাত্র থাকিত না, এবং উহা দৃষ্টতঃ সম্পূর্ণরূপে মিডিয়ম-অবস্থার বহির্ভূত। যাহা হউক, আজকাল দেশবিদেশে এই সকল বিষয় যতটা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, আমাদের বর্ণিত সময়ে সেরূপ ছিল না। সুতরাং ব্লাভাস্কীকৃত এই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার অবলোকন করিয়া তদানীন্তন সমাজ বিশেষরূপে আন্দোলিত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বক্ষ্যমান ঘটনাবলী হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়।

জেলিহোবাস্কীর শ্বশুর-গৃহে প্রত্যহ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিতেন। বিশেষতঃ ব্লাভাস্কীর আসিবার পর শত শত লোক তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। সকলেই পর্ব্বত-প্রমাণ সন্দেহ লইয়া আইসেন, কিন্তু ফিরিবার সময় কাহারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। নানা লোকে নানা ভাষায় প্রশ্ন করিতেন। ব্লাভাস্কী অবশ্যই সকলের ভাষা বুঝিতেন না, কিন্তু

শব্দাভিঘাত দ্বারা প্রত্যেকের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদত্ত হইত। তিনি কোন চাতুরী বা কৌশল অবলম্বন করেন কিনা, সবিশেষ জানিবার জন্য কতলোক কত প্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিত। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের পরীক্ষায় সম্মত হইতেন। ফলে, তাহাদের সন্দেহ মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইত। বস্তুতঃ, বাহ্য-দৃষ্টিতে ঐ সকল শব্দের সহিত তাঁহার কোনই সংশ্রব ছিল না। যখন নানা স্থানে 'ঠুক্-ঠুক্' শব্দ হইতেছে, তখন তিনি কি করিতেন? তিনি একটা 'সোফা,' বা হস্তোপাঠানযুক্ত চৌকিতে বসিয়া অতি শান্তভাবে আপন মনে কোন কারুকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রশ্ন উত্তরাদি লইয়া উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে আন্দোলন-জনিত যে গোলযোগ হইত, তৎপ্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, বাহিরের কোন কিছুর সঙ্গে যেন তাঁহার সম্বন্ধই নাই। এইভাবে তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে কারুকার্য্য করিতে থাকিতেন। অথচ, সে গৃহে গোলযোগ বড় কম হইত না। একজন শব্দলক্ষিত বর্ণগুলি বলিয়া যাইতেছেন, অপর কোন ব্যক্তি উত্তর লিখিয়া লইতেছেন, অপরাপর লোকেরা আবার মনে মনে কত কি প্রশ্ন করিতেছেন, আর অমনি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও আসিতেছে, ইত্যাদি ব্যাপার গৃহমধ্যে অনবরত চলিতে থাকিত। এমনও হইত যে, কেহ স্বীয় প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না, কেহ বা আংশিক উত্তর পাইল। আবার কেহ উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাইল না, কিন্তু তদ্দণ্ডেই অপর কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া শব্দ তাহার অপ্রকাশিত মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিয়া বসিত। যখন এইরূপ ঘটনা হইত, তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী-মধ্যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় বহিয়া যাইত। বাক্‌বিতণ্ডায় উত্তেজনায় কেহ ব্লাভাস্কীর প্রতি অবিশ্বাসের ভাব-প্রকাশ করিত, কেহবা তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত, কখনও কেহবা তাঁহার উপর কপটতার আরোপ করিয়া শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিত। কিন্তু তিনি একান্ত ধীরতার সহিত এ সকল উপদ্রব সহ্য করিতেন। এবং ইহা লইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট কোন অলৌকিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইলে, তিনি উপেক্ষার সহিত হাসিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। তাঁহার সেই হাসিতে, সেই উপেক্ষার ভঙ্গিতে, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার বুদ্ধি বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত।

তথাপি প্রশ্নের বিরাম ছিল না। 'তুমি এ সব করিতেছ কি করিয়া? এ সকল শব্দ কি? লোকের মনের ভাব তুমি কিরূপে বুঝিতে পার?'—ইত্যাদি প্রশ্নের উপর প্রশ্নে লোকে ব্লাভাস্কীকে অনবরত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রথমতঃ, তিনি নিজে এ সকল শব্দের কর্ত্তা নহেন বলিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়,—প্রশ্নের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত হওয়ায়,—সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট বলিতেন—"আমি এ সব তর্ক-বিতর্কে বড়ই বিরক্ত হইয়াছি, আর আমি এ সকল বিষয়ে কিছু বলিব না।' সুতরাং, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মৌনী হইয়া থাকিতেন, অথবা উপেক্ষার হাস্য ব্যতীত অন্য উত্তর দান অনাবশ্যক মনে করিতেন। কিছুকাল এইভাবেই কাটিল। কিন্তু আবার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। যখন মনটী প্রফুল্ল থাকিত, তখন তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়া কেহ কোন অপমান-সূচক বাক্য বলিলেও রুষ্ট হইতেন না। বস্তুতঃ, অবিশ্বাসীগণ নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব হেতুবাদের উদ্ভাবন করিত। দৃষ্টান্ত যথা,—

কেহ হয়ত বলিত, ব্লাভাস্কীর পকেটে একটা কল আছে, সেই কলটাই এই শব্দের মূল। কেহ বলিত, তিনি স্বীয় নখাগ্রদ্বারা ঐরূপ 'ঠুক্-ঠুক' শব্দ করেন। আবার কোন অসাধারণ বুদ্ধিমান এমন অপূর্ব্ব মতও প্রকাশ করিত যে, ব্লাভাস্কীর হাত দুটাই না হয় দৃষ্টতঃ একটা কাজে নিযুক্ত আছে, কিন্তু পা? তিনি পা দিয়াও ত ওরূপ শব্দ করিতে পারেন!!

এ প্রকার অসার কথাও আর না উঠিতে পারে, তজ্জন্য তিনি যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, তাহার নিকট সেইরূপ পরীক্ষাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনুসন্ধান করা হইল, হস্তপদ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে একটা কোমল বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখা হইল, পা হইতে জুতা খুলিয়া লইয়া পদদ্বয় সকলের দৃষ্টিতলে অতি কোমল একটা বালিসের সহিত বন্ধন করা হইল। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইবার পর তাঁহাকে বলা হইল,—'আচ্ছা এখন শব্দ কর দেখি। তোমার নিকটে নয়, দূরে শব্দ করিতে হইবে।' তিনি বলিলেন, 'চেষ্টা করিয়া দেখিব।' সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গৃহের ছাদে, গবাক্ষকাষ্ঠে, পার্শ্বস্থ-প্রকোষ্ঠের প্রত্যেক দ্রব্যে এবং অন্যান্য ব্যবহৃত স্থানে 'ঠুক্-ঠুক্' শব্দ হইতেছে।

কখনও কখনও তিনি আমোদচ্ছলে, অবিশ্বাসীর সন্দেহের সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ, কথার পরিহাস কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিতেন। একদিন জনৈক যুবক অধ্যাপকের চশমার উপর ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হইতে লাগিল! এমন জোরে আঘাত হইতেছিল যে, অল্পক্ষণ মধ্যে চশমাজোড়াটী অধ্যাপকের নাসিকাদেশ ত্যাগ করিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। ব্লাভাস্কী তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে ছিলেন। ভয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। আর একদিন একটী প্রগল্‌ভা-গর্ব্বিতা রমণী ব্যঙ্গ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শব্দাভিঘাত ভালরূপে হয় কোন্ দ্রব্যের উপর? না, সর্ব্বত্রই একরূপ?" শব্দ হইতেই উত্তর আসিল, 'স্বর্ণের উপর।' উত্তরটা একটু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু শব্দে আবার প্রকাশিত হইল,—'আমরা এখনই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাকে দিতেছি।' রমণী ইহা শুনিয়া অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণ মধ্যে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হাত দিয়া আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখিলেন। কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহার মুখের ভিতর ঠুক্-ঠুক্ শব্দ হইতেছিল। নিজেও ইহা স্বীকার করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে পরস্পর তাকাতাকি করিতে লাগিল। কথাটা কি রমণীকে আর বেশী বুঝাইয়া বলিতে হইল না। সকলেই বুঝিলেন, তিনি কৃত্রিম দন্ত পরিয়া আসিয়াছেন, এবং সেই 'বাঁধা' দাঁতের স্বর্ণ তারে ঠুক্ ঠুক্ শব্দে বিষম আঘাত লাগিতেছে। বিদ্রূপ করিতে গিয়া এমন লজ্জিত হইতে হইবে, ইহা তিনি মনে করেন নাই। তিনি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গৃহমধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

ব্লাভাস্কী যেন একটী রহস্যময় জগৎ সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ পর্য্যটনের মধ্যে তিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কোথাও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। সে অধ্যায় অন্ধকারাবৃত। কিন্তু ভ্রমণান্তে যখন তিনি সভ্যতার দিবালোকে স্বদেশে পুনরাগত হইলেন,

তখন দেখা গেল; তিনি বিবিধ সিদ্ধির অধিকারিণী, এবং তাঁহার আবাল্য—উন্মেষিত অতীন্দ্রিয়-শক্তি-সমধিক স্ফুরিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পর অধ্যায়ে বর্ণিত দুই একটী ঘটনার ইহার সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ।

নিবেদন।

মান্যবর "নব্যভারত" সম্পাদক মহাশয়, আমার প্রেরিত এই প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ তিনটীর জন্য আপনার নব্যভারতে একটু স্থান হইলে বাধিত হইব। বর্ত্তমান সাহিত্যিক দলাদলির যুগে, মনোমত কথা যে না বলে, তাহাকে অনেকেই ঘরে ঢুকিতে দিতে নারাজ, আপনার নব্যভারতের দ্বার তাহার জন্য খোলা আছে এবং এই গুণে নব্যভারত কোন দল বিশেষের পত্র হয় নাই এবং এইজন্যই নব্যভারতের পাঠকগণকে একরকমের ও একঘেয়ে ভাবের প্রবন্ধ পড়িয়া পরিশ্রান্ত হইতে হয় না। নব্যভারতে যেরূপ স্বাধীনভাবে লেখকগণ বাদ-প্রতিবাদ, কি আলোচনা করিতে পারেন, অন্য কোথাও তাঁহাদের সেরূপ সুবিধা আছে বলিয়া জানি না।

নিবেদক—শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা,

গিরিডি—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১৯

প্রথম প্রবন্ধ।

শ্রীহরি শরণম্, গিরিডি ২০শে বৈশাখ, ১৩১৯

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাপদেষু—

নমস্কার নিবেদন,—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব। যদি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ফেরত পাঠাইবেন, তজ্জন্য ডাক-মাশুল-স্বরূপ দুই পয়সার টিকেট পাঠাইলাম। নিবেদনমিতি।—

বিনীত শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পিত হইল।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২১ শে বৈশাখ, ১৩১৯।

* এই প্রত্যর্পিত প্রবন্ধ আমার নিকট ডাকে অদ্য ৪ঠা শ্রাবণ পৌঁছিয়াছে। শ্রীমঃ

তিনটী প্রশ্ন।

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমি গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসের "প্রবাসী" ঠিক সময় পড়িতে পারি নাই, সম্প্রতি উহা পাঠ করিয়া আমার মনে তিনটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, প্রশ্ন তিনটী লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি প্রবাসীতে সদুত্তর সহ উহা প্রকাশিত হয়, তবে বাধিত হইব। বলা বাহুল্য যে পাঠকদিগের মধ্যে একজনার মনে যে প্রশ্ন উঠে, উহা শুধু সেই একজনারই কথা নহে, অনেকের মনের কথা। সুতরাং কোন প্রশ্নকেই একজনের প্রশ্ন-ভাবিয়া উত্তর দানে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে।

প্রথম প্রশ্ন। চৈত্র মাসের "প্রবাসীতে" বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে একটী প্যারায় লিখিত হইয়াছে "সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখন যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।"

একজন বাঙ্গালা সাহিত্যিক, বঙ্গভাষার সমালোচক ও একখানি মাসিক সাহিত্য পত্রের সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কোন নাটক পড়েন নাই, একথা শুনিয়া

খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গিরিশচন্দ্র কি কোন অশ্লীল গ্রন্থ লিখিয়াছেন? আমরা ত জানি, তাঁহার অধিকাংশ নাটকই ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয়। বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল নাটক লিখিয়াছেন, তাহা সহস্র সহস্র লোক পড়িয়াছে, পড়িতেছে এবং পাঠ করিয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এদেশের অন্য কোন লেখক ততগুলি লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থ যতলোকে পাঠ করিয়াছে ও করিতেছে, অন্য কাহারও গ্রন্থ সেরূপ পাঠ করিতেছে কিনা, জানি না। তাঁহার গ্রন্থকে বুৎসিৎ বলার কোনই কারণ নাই, তবে যদি "প্রবাসী" মনে করিয়া থাকেন যে, সেগুলি অবশ্যই কাব্যরসহীন হইবেই হইবে, তথাপি দেশের এত অধিক সংখ্যক লোক যে সকল গ্রন্থ আগ্রহ সহকারে পাঠ করে, তাহাতে সাপ, বেঙ, বিছা কি আছে, একজন সাহিত্য-সেবী সাহিত্য-সংস্কারকের পক্ষে তাহা একবার দেখিয়া লওয়া উচিত। "আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই" একথাটা একটু গৌরব করিয়াই বলা হইয়াছে, নতুবা "দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই" লেখা হইত। কিন্তু ইহাতে সাহিত্যাচার্য্যদিগের গৌরব করার কি আছে, যে তাঁহারা একজন "সুপরিজ্ঞাত নাটককারের" কোন গ্রন্থই পড়েন নাই। লেখক যে "বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারে কখনও যান নাই" ইহাতে কাহারও বলিবার কিছু নাই। আমরাও থিয়েটার দেখার পক্ষপাতী নহি। থিয়েটারে যিনি যান না তিনি কি নাটক পড়িতে পারেন না? যে গ্রন্থ এ দেশের থিয়েটারে অভিনীত হয়, যদি তাহা পড়া অবৈধ মনে করেন, তবেত কোন নাটকই পড়িতে পারেন না। বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবী ও সমালোচকের মুখে, গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক না পড়ার কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিলে, লোকেরা কি মনে করিতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। চৈত্র মাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যত্র আছে, "কলিকাতায় একটা সমাজ-সংস্কার-সমিতি আছে বলিয়া বৎসরের মধ্যে একদিন শুনা যায়, অথচ *কলিকাতা ও বঙ্গদেশ সামাজিক বিষয়ে* ভূস্বর্গ ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কাজ করিবার লোকের অভাবে, অর্থের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ অতি ক্ষীণ ভাবে চলিতেছে, অথচ ব্রাহ্মেরা সকলেই বা অধিকাংশই ভিক্ষুক, বা ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্র-আধ্যাত্মিকতাদি হিসাবে যোগ্য লোক বিরল, তাহা বলিবার যো নাই, অন্য সম্প্রদায়ের কথা বলিব না, কারণ তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ সংবাদ জানিনা।"

লেখক বলিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন হিন্দু মুসলমান কোন সমাজের আভ্যন্তরীণ সংবাদ জানেন না। কি জানেন না, তাহাও স্পষ্টই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ, অন্যান্য সমাজের লোকেরা ভিক্ষুক কি ধনী, তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা কিরূপ, তাহা কিছুই জানেন না। লেখক কোন্ দেশের লোক, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। তবে তিনি যে এ দেশের সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ তিনি একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোন সমাজের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কোন খবর রাখেন না বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। "প্রবাসী" একখানা

সাহিত্য পত্র; উহা "তত্ত্বকৌমুদী" কি "খ্রীষ্টীয় বান্ধব" নহে। কিন্তু "প্রবাসী"র লেখায় যেরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে, কোন সাম্প্রদায়িক কাগজের পক্ষেও তাহা গৌরবজনক নহে। ব্যক্তিবিশেষ, ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু-সমাজ কি খ্রীষ্টান সমাজের মত ও কার্য্য সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহাতে কিছু মাত্র দোষ হয় না; সেই ব্যক্তির মতের ভাবই লোকেরা বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল লেখায় কোন লেখকের নাম স্বাক্ষর থাকে না, অন্ততঃ একটা 'শ্রীঃ'ও থাকে না, সে গুলিকে সম্পাদকের লেখা বলিয়া ধরিতে হয়, অন্ততঃ সে সকল লেখার জন্য সম্পাদক যে দায়ী, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। "প্রবাসী"র মলাটের উপরে সম্পাদক বলিয়া যাঁহার নাম লিখিত থাকে, তিনি কি সত্য সত্যই তাঁহার জন্মভূমির (ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন) অন্যান্য সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ অনভিজ্ঞ? সত্য সত্যই কি তিনি আপনাকে গণ্ডী কাটিয়া পৃথক করিয়াছেন? যদি ইহা সত্য হয়, তবে কি ইহা একটা নূতন ধরণের "অচলায়তন" নহে? স্ব-দেশীর প্রতি এতদূর অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ কি কোন স্বদেশ-হিতৈষীর পক্ষে শোভন হয়?

তৃতীয় প্রশ্ন। বর্ত্তমান্ বৈশাখের "প্রবাসী"তে "মৌনীবাবা" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী নির্ঝরিণীঘোষ-লিখিত "মৌনী বাবা" নামক গ্রন্থ হইতে তিনি তাঁহার সমগ্র প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে, মৌনীবাবার সংক্ষিপ্ত-জীবনী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ৺প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন; তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন-প্রণালীতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, তিনি সংসার ছাড়িয়া, মৌনাবলম্বন ও অজাগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিত্রকূটে ও ওঁকারনাথে কঠোর তপস্যা করেন। তিনি তপস্যার প্রথম অবস্থায় মানুষ-গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না এবং গুরুবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন। কিন্তু সাধনের পরিণত অবস্থায়, জীবনের শেষ ভাগে, তিনি মনুষ্য-গুরুর একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কেবল স্বীকার করেন, এরূপ নহে, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, ব্যক্তি বিশেষকে গুরুত্বে বরণ করেন। এ বিষয় গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের উক্তি এইরূপ,—"চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা প্রেমিক হইতে না পারিতেছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই গুরু-গ্রহণ করিতে হইবে।" (৬৬পৃষ্ঠা) অন্যত্র, "গুরু-গ্রহণ না করিয়া যে এই পথে যায়, তাহাকে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" (৬৩পৃষ্ঠা)

অন্যত্র, "যদি পূজনীয় গুরু বিজয় বাবুকে একবার আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া এইদিকে পাঠাইতে পার, পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। আমি ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" (৭৪ পৃষ্ঠা)। ইহার পরে গুরুবাদ সম্বন্ধে আরও তাঁহার উক্তি ও পত্র আছে, সে গুলি অনবধানতা-প্রযুক্ত গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই এবং নূতন সংস্করণে গ্রন্থকর্ত্রী উহা সন্নিবেশিত করিবেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছেন। মহেশবাবু মৌনীবাবার আত্মীয়। সম্ভবতঃ তিনি সে সকল কথা জানেন। কিন্তু সে কথায় কাজ নাই, গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই বিবেচ্য। উপরের উক্তি গুলিতে

স্পষ্টই বুঝা যায়,মৌনীবাবা মানুষ-গুরু স্বীকার ও মানুষ গুরু গ্রহণ করিযাছিলেন। সাধনের পরিণত অবস্থায় ইহাই তাঁহাব জীবনেব বিশেষ পরিবর্ত্তন। কিন্তু মহেশবাবু একথাগুলি প্রকাশ কবেন নাই। তাহাতেও তেমন বলিবার কিছু থাকিত না, যদি তিনি মৌনীবাবাব পূর্ব্বজীবনেব একটা কথা তুলিযা তাঁহাকে গুরুবাদ-বিবোধী কবিযা প্রবাসীব পাঠকবর্গেব নিকট উপস্থিত না কবিতেন। তিনি মৌনীবাবাব উক্তি হইতে এই কথাটী তুলিযাছেন—"এমন গুরুকে (ঈশ্বরকে) ফেলিয়া লোকে মানুষকে অন্বেষণ কবিয়া বেড়ায়।" এই উক্তিটী গ্রন্থেব ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে এবং উহা চিত্রকুটে বাস-কালীন উক্তি। আমি গুরুবাদের সপক্ষে মৌনীবাবাব যে কয়টী বাক্য উদ্ধাব কবিযাছি, উহা ৬৩,৬৬ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় উক্তি এবং উহা ওঁকাবনাথে থাকা কালীন সাধনেব পবিণত অবস্থাব উক্তি। মহেশবাবুব উদ্ধৃত অংশ পাঠ কবিয়া লোকেবা অনায়াসে বুঝিবে যে, মৌনাবাবা গুরুবাদ-বিবোধী ছিলেন, অথচ সে কথা সত্য নহে। কোনও ধর্ম্ম-সাধকেব জীবনেব এতবড় একটা পবিবর্ত্তনের কথা ঢাকিযা বাখিলে নিশ্চযই সত্যেব অবমাননা কবা হয। "মৌনীবাবা" গুরুবাদী ছিলেন, একথা লোকে জানিলেই যে, ব্রাহ্ম-সমাজেব বিশেষ অনিষ্ট হইবে, অথবা তিনি গুরুবাদ মানিতেন না, একথা বলিলেই যে গুরুবাদ নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কা করাব কোন কারণ নাই। তবে সাহিত্যে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগেব নিকট সত্যকে আববণ না কবে, এজন্য লেখক-মাত্রেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ইতিহাস সর্ব্বদাই সত্যবাদী হইবে। কোন সাধকেব জীবন-চবিত, জাতীয-সাধনাব খণ্ড-ইতিহাস. কাহারও চিত্র বিকৃত করিয়া অঙ্কিত কবিলে তেমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু জীবন-চবিতে একবিন্দু অসত্য থাকিলে ভবিষ্যৎ-কালে উহা অসত্যেব প্রবাহ সৃষ্টি কবে; এবং যে লেখক সত্যকে মলিন কবেন, তিনি অনন্তকালেব জন্য ভবিষ্যৎ-বংশের নিকট এবং জাতীয়-সাহিত্যেব নিকট অপবাধী থাকেন। মহেশ বাবু একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম, তিনি এরূপ অপবাধ কবিলেন কেন?

২য় প্রবন্ধ।

গিরিডি ১২ ই আষাঢ়, ১৯১২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

নমস্কার, নিবেদন, "আমার আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান" প্রবন্ধের উত্তরে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "উহা উত্তরে উপেক্ষা প্রদর্শন" মাত্র। তাহার মন্তব্যের মধ্যে এইভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, আমি তাহার গ্রন্থ বুঝিতে পারি নাই। তদুত্তরে আমার যাহা বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলাম, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "প্রবাসীতে" ইহার জন্য একটু স্থান দান করিলে বাধিত হইব। শেষকথা বলিবার ন্যায়তঃ অধিকাব আমার আছে, আশা করি আমি সে অধিকারে বঞ্চিত হইব না। এরূপ আলোচনায় ব্রাহ্ম সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার নাই, কেন না, যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদ যে সত্য নির্ণয়ের একটী বিশেষ উপায়, তাহা আপনাকে আর বলিবাব প্রয়োজন নাই।

নিবেদনমিতি,

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

উত্তর দানে উপেক্ষা প্রদর্শন।

"প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ যেহেতু তিনি আমাব "আত্মজ্ঞান" ও "বিষয়জ্ঞান" নামক প্রবন্ধটী গত আষাঢ় মাসেব "প্রবাসী"র আলোচনা-স্তম্ভে প্রকাশিত করিয়াছেন।

জানিনা কি কারণে আমার মনে হইয়াছিল যে, আমার প্রবন্ধটী তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তরকে অঙ্কে লইয়া প্রকাশিত হইবে। অনেক বন্ধুকে আমার এই মনের ভাবটা বলিয়াও ছিলাম। যদি সম্পাদকগণ সকল সময় অপক্ষপাতে এই রীতি রক্ষা করেন, অর্থাৎ যে প্রবন্ধে যাঁহার লেখার প্রতিবাদ থাকিবে, সেই প্রবন্ধ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়া উত্তর সহ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন,তবে লেখকগণেরও অনেকটা সময় বাঁচিয়া যায়, পাঠকগণেরও বাদ প্রতিবাদ বুঝিবার সুবিধা হয়। কিন্তু সীতানাথবাবু আমাকে নিরাশ করিয়াছেন, তিনি উত্তর দানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, আমি তাঁহার "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ভাল করিয়া পড়ি নাই এবং "কয়েক বার" উহা "ভাল করিয়া" পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সাহিত্য-সংসারের একজন প্রবীণ অভিভাবকের, আমার মতন একজন সামান্য ব্যক্তিকে, এরূপ উপদেশ দেওয়া হয়ত তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে; কিন্তু উহাতে আমার শ্রম সফল হয় নাই। কেন না, তাঁহার গ্রন্থ খানি "খুব ভাল করিয়া" "বহুবার পাঠ করিয়া" তবে আমি প্রতিবাদ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমার সংশয় কিরূপে মিটিবে? গ্রন্থখানা পাঠ করিয়াইত সংশয় জন্মিয়াছে। একটু ইতিহাস বলা সঙ্গত।

যখন বিশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে এই "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বরিশালে একটী প্রতিভা-শালিনী মহিলা ও সিটি কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষক শ্রীমান্ অন্নদাচরণ সেন বি-এ, আমার নিকট উহা রীতিমত পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু "আত্ম-জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান" পড়াইতে যাইয়াই আমার সন্দেহ জন্মিল যে সীতানাথ বাবুর প্রদত্ত যুক্তি-ঘাত-সহ নহে। পুস্তক খানি পড়াইতে যাইয়া যে আমাকে "ভাল করিয়া" "অনেক বার" পড়িতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কয়েক মাস পরে কলিকাতায় আসিয়া আমি আমার কয়েক জন দার্শনিক ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা আমার আপত্তি খণ্ডন করিয়া সীতানাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। তখন ইঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য দার্শনিক "গ্রিণের" গোঁড়া চেলা। গত ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা সভায় অনেক সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল দার্শনিকের সহিত এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি, কেহই সীতানাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। গত বৈশাখ মাসের পূর্ব্ব বৈশাখে আমি আমার এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ করি। ছয় মাস কাল ব্রাহ্ম-সমাজের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিকে পড়াইয়া শুনাই, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান-বৃদ্ধ দেশমান্য সুবিখ্যাত দার্শনিক, কেহ বা সুবিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক, সকলেই ব্রাহ্ম। ইঁহারা সকলেই আমাকে সমর্থন করেন, অন্ততঃ আমি সীতানাথ বাবুর যে সকল ভ্রম-প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহার পরে কলিকাতায় যাইয়া কোন সুবিজ্ঞ চিন্তাশীল দার্শনিক ব্রাহ্ম বন্ধুকে পড়িয়া শুনাই। যখন তিনিও আমাকে সমর্থন করিলেন, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া গত আশ্বিন মাসে প্রবন্ধটী আমি "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে প্রদান করি। প্রবাসী আফিসে আট মাস গর্ভ যাতনা ভোগ করিয়া প্রবন্ধটী গত আষাঢ়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আট মাস কালও আমি

নিশ্চিন্ত থাকি নাই, অনেকের কাছে প্রবন্ধটী পড়িয়াছি, কোন কোন প্রাচীন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্ম সীতানাথ বাবুর পুস্তক ও আমার প্রবন্ধ উভয়ই আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া পাঠ করিয়াছেন। কাহারও নিকট হইতে আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আমি কোন সংবাদ পাই নাই। যদি একটা চিন্তাশীল বন্ধুও বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন, আমি তৎক্ষণাৎ আফিসে টেলিগ্রাম করিয়া প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিতে বাধা দিতাম। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি অল্প সাবধানতা অবলম্বন করি নাই, এ অবস্থায় পুস্তক খানা ভাল করিয়া পড়ি নাই বলিয়া সীতানাথ বাবু যে অভিযোগ করিয়াছেন, উহা একান্তই অমূলক। আরও দুই একবার পড়িলে যে আমার নিকট নূতন কোন আলো আসিবে, এরূপ আশা নাই। তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার লিখিত পুস্তক ভাল করিয়া পড়ি নাই" কেন না আমি তাঁহার "ব্যাখ্যাত দুইটী মূল তত্ত্বের মধ্যে প্রথমটীকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয়টীকে প্রথম করিয়াছি।" ইহা খুঁটি নাটি ওজর মাত্র। যদি বা আমি ওরূপ উলট পালট করিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মাত্র আসে যায় না, কেন না উক্ত উভয় তত্ত্ব লইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচার চলিতে পারে এবং আমি স্বতন্ত্র ভাবেই বিচার করিয়াছি। আমি যাহা লিখিয়াছি, সে সকল খুবই মোটা কথা এবং স্পষ্ট কথা। তাঁহার পুস্তকের কোথায়ও সে সকলের উত্তর নাই, এবং আমার লিখিত আপত্তিগুলি যে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। যদি উদিত হইত, তবে অন্ততঃ আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি পাঠকগণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সে সকল আপত্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করা উচিত ছিল। তিনি ত অনেক মোটা কথাকেও বহু উক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এগুলির বেলায় উপেক্ষা কেন? বস্তুতঃ, পদ্মা নদী যেমন এক কূল গড়িতে যাইয়া অপর কূল ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ সীতানাথ বাবুর যুক্তিও একদিক গড়িতে যাইয়া আর একদিক ভাঙ্গিয়াছে। বলিতে গেলে, তিনি যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডালই কাটিয়াছেন।

তাঁহার "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের আদ্যন্তই এক তরফা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাণের আবেগ অত্যন্ত হইলে দুই কূল রক্ষা করিয়া চলা মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য কার্য্য। যাহা অনেকেই পারে না, সীতানাথ বাবুও তাহা পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার উত্তরে উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণ কিছু বুঝিলাম না। উপসংহারে আবার বলিতে হইতেছে যে, আমার প্রশ্নের উত্তর ও সন্দেহের নিরশন তাঁহার গ্রন্থে কোথাও নাই, এমন কি, এরূপ প্রশ্ন যে উঠিতে পারে, তাহার আভাসও তাঁহার গ্রন্থে নাই। যদি কেহ আমার ভুল বুঝাইয়া দিতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার চরণে অবনত হইব।*

তৃতীয় প্রবন্ধ।

গিরিডি

শ্রীহরিশরণম্ ১৪ই আষাঢ় ১৩১৯

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।—

নমস্কার নিবেদন.—

এই ক্ষুদ্র আলোচনাটুকু আপনার সুবিখ্যাত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব। শিষ্টভাবে রবীন্দ্রবাবুর ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা

* এই প্রবন্ধ ও প্রত্যর্পিত হইয়া আমার নিকট অদ্য ৪ শ্রাবণ পৌঁছিয়াছে। ইহা হইতে যতটুকু সার-সংগ্রহ করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমার প্রতিবাদকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করা হইয়াছে। শ্রীঃ—

করিতে অনেকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন, এই জন্য এই কয়েক ছত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি আপনারা প্রকাশিত না করেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ফেরত পাঠাইবেন। আপনাদের বিজ্ঞাপিত নিয়মানুসারে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইবার জন্য এইসঙ্গে অর্দ্ধ আনার টিকেট, পাঠাইলাম।

ভবদীয় শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের ধারা।

দুইটী প্রশ্ন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত আষাঢ়ের "প্রবাসীতে" তাঁহার পরম স্নেহ-ভাজন কণিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ইতিহাসের ধারার" সমর্থন করিতে যাইয়াও কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে একটী এই যে, "হর-ধনু-ভঙ্গ ব্যাপারটাকে কোন্ বিঘ্নভাঙ্গান বলিব?" আমিরাও উক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকরণ করিয়া কয়েকটী প্রশ্ন করিব এবং তাঁহার ভাষায়ই বলিব যে, "সে দুই একটী কথা ইঙ্গিত করিলাম, তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটীর অঙ্গ-পূরণ করা হইলে ভাল হয়।" "মণৌবজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তিবে গতিঃ" এই রীতির অনুসরণ করিয়াই প্রশ্ন করিলাম।

প্রথম প্রশ্ন।

রবি বাবু বলিয়াছেন, "বশিষ্ঠের সনাতন ধর্ম্মই ছিল, রামের কুলধর্ম্ম; বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চির পুরাতন পুরোহিত বংশ, তথাপি অল্প বয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিপক্ষপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈত্রিক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন"। ইত্যাদি।

রামায়ণের উক্তি এই যে, দশরথ বিশ্বামিত্রকে স্বীয় ভবনে উপস্থিত দেখিয়া, সানন্দে অমৃত প্রাপ্তি, পুত্রহীনের বৈধপুত্রলাভ এবং অনাবৃষ্টিতে ধারাবৃষ্টি পাতের ন্যায় আনন্দ লাভ করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র যাহা চাহিবেন, তাহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যে বিরোধ, দলাদলি অথবা অবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই।

বিশ্বামিত্র বহুকালব্যাপী একটী বিশেষ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। দুইটা ভীষণ রাক্ষস সেইযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল, তাহাদিগকে বধ করার জন্যই তিনি রামচন্দ্রকে চাহিয়াছিলেন, এবং চাহিয়াছিলেন শুধু দশদিনের জন্য, দলভুক্ত করার জন্য নহে, যথা রামায়ণে,—

দশরাত্রস্য যজ্ঞস্য তস্মিন্ রামেণ রাক্ষসৌ
হন্তব্যৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ মম যজ্ঞস্য রৈরিণৌ।"

এই উক্তিতে সকল কথাই স্পষ্ট আছে, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ করা এবং তাঁহার যজ্ঞবিঘ্ন-নিশাচরদ্বয়কে বধ করার জন্য দশদিনের জন্য রামকে চাওয়া। বিশ্বামিত্র যজ্ঞবিঘ্নকর রাক্ষস বধ করিতেই রামকে লইয়া গিয়াছিলেন, কৃষিবিস্তার অথবা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের আভাসও ইহার মধ্যে নাই। রাক্ষসবধের জন্য মন্ত্রপূত অনেক অস্ত্র বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কোন কথাই তাহাকে বলেন নাই।

রাজা দশরথ বালক রামকে দুরন্ত নিশাচরের যুদ্ধে পাঠাইতে ভীত ও অস্বীকৃত হইলেন, বিশ্বামিত্র নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন বশিষ্ঠদেব রাজাকে বুঝাইয়া, বিশ্বামিত্রের গুণ ও ক্ষমতা বর্ণনা করিয়া রাজাকে রাজি করিলেন, যথা রামায়ণে,—

তথা বশিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্॥

বস্তুতঃ, দশরথ বিশ্বামিত্রের ভয়ে পুত্রদান করেন নাই, কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশেই করিয়াছেন।

বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে এক সময়ে খুব বিরোধ হইয়াছিল, সে বিরোধে বিশ্বামিত্র সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বশিষ্ঠের কৃপা এবং আশীর্ব্বাদেই প্রার্থিতপদ লাভ করিয়াছিলেন, সেই হইতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, বিশেষ বন্ধুত্বই আছে। যদি না থাকিত, তবে বিশ্বামিত্র কৃতঘ্ন হইতেন। এ অবস্থায় রামচন্দ্রকে "ছিনাইয়া লওয়ার" কথা কিছুতেই খাটে না। সেরূপ ভাবই রামায়ণে নাই। বিশেষতঃ, দশ দিনের জন্য নেওয়াকে ছিনাইয়া দলে নেওয়া বলা যায় না। গুরুর আজ্ঞায় নিশ্চিত হইয়া, দশরথ দশদিনের জন্য রামকে দিলেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকেও সেই সঙ্গে দিলেন। ছিনাইয়া লইলে, একটীর বদলে, ইচ্ছা করিয়া, দুইটী কেহ দেয় না, বিশেষ বিপক্ষের হাতে।

বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া (রাক্ষস বধের পরে) যখন মিথিলায় জনকরাজ গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন জনক একটী বৃহৎ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, যাজ্ঞিক ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ উক্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং জনক রাজা যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন, উহা বিপরীত কথা।

এ সকলের মীমাংসা কি? সকল কথা বাদ দিলে রামায়ণের কিছুই থাকে না, সমস্ত রামায়ণ পরিত্যাগ করিতে হয়। রবি বাবু বিশামিত্র ও জনক প্রভৃতির যজ্ঞবিরোধিতার কিছুমাত্র প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

অহল্যা।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে "অহল্যা" পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া, আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। মোটকথা এই যে, অহল্যা একটা পতিতভূমি (Waste land) রামচন্দ্র তাহাকে কৃষিক্ষেত্র করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া সরযূর তীরে তীরে আসিয়া শোণ নদী পার হইয়া কোন্ কোন্ রাস্তায় মিথিলায় গিয়াছিলেন, তাহার পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট চিত্র রামায়ণে রহিয়াছে। উহার সহিত দক্ষিণাপথের কোনও সম্বন্ধ নাই, দক্ষিণাপথের রাস্তায় তাহারা গমন করে নাই। তাহার পরে অহল্যা কোথায় পাষাণী হইয়াছিলেন, সে বিষয় রামায়ণ কি বলেন, দেখা যাউক, যথা,—

তাং দৃষ্ট্বা মুমুদঃ সর্ব্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্।
সাধুসাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্॥
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জ্জনং রম্যং প্রপাদ মুনি পুঙ্গবম্॥
ইদমাশ্রম-সংকাশং কিং ন্বিদং মুনি বর্জ্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবান্ কস্যায়ং পূর্ব্ব আশ্রমঃ॥

অর্থাৎ ঋষিগণ (বিশ্বামিত্রের সঙ্গীয় মুনিগণ) মিথিলাপুরী দর্শন করিয়া "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন। সেই মিথিলা নগরের এক উপবনে পুরাতন নির্জ্জন বন্য একটী আশ্রম দেখিয়া রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কাহার পূর্ব্ব আশ্রম?"

রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র বলিলেন, ইহা গৌতমাশ্রম, এখানে পতিশাপে

অহল্যা পাষাণ হইয়া আছেন। ইহার পরে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেখানে লইয়া গেলেন, অহল্যা রাম দর্শনে শাপমুক্ত হইলেন। রাজপুরীর নিকটে (মিথিলা মিউনিসিপালিটীর মধ্যে) অহল্যা ছিলেন। সুতরাং দক্ষিণাপথের যাত্রীদিগের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না, রম্য উপবনে ছিলেন, সুতরাং সে স্থান পতিত জমি (waste land) নহে। মহাপাপে পাপী ব্যক্তিও ভগবৎ স্পর্শে কিরূপে মুহূর্ত্তে মুক্তি লাভ করে, রামায়ণের কবি অহল্যার উপাখ্যানে তাহাই দেখাইয়াছেন, পতিত জমির উদ্ধার-সাধন দেখান্ নাই।

যদি সমস্তটা রূপক ধরিয়া লওয়া যায়, তবু সামঞ্জস্য হয় না। ইন্দ্র, মেঘের অধিপতি, তাহার সঙ্গে সঙ্গ ঘটিয়াছে বলিয়া কোন ভূমিখণ্ড অনুর্ব্বরত্বের অভিশাপ লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ অহল্যা বন্ধ্যা নহেন, তাহার গর্ভজাত পুত্র শতানন্দই জনক রাজার পুরোহিত, ইহারও একটা ব্যাখ্যা ত দিতে হইবে।

রামচন্দ্র অল্প কয়েকদিন মিথিলায় ছিলেন, ইহার মধ্যে কিরূপে একটা অভিশপ্ত উর্ব্বরা ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন? বস্তুতঃ সমগ্র রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত কৃষিকার্য্যের কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, এরূপ অবস্থায় অহল্যা ও সীতা শব্দের অর্থ ধরিয়া তাঁহাকে একজন বিশেষ কৃষিতত্ত্ববিদ্ করিয়া তোলায় কিছুই কারণ দেখা যায় না। এই "অহল্যার" কল্পনাটী যে রবীন্দ্রনাথের নিজের নহে, ইহা তিনি যে আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

উপসংহার।

আমরা রামায়ণ হইতে উপরে যে সকল কথা তুলিয়াছি, তাহাতে জানা যায় যে, (১) বশিষ্ঠ, দশরথ, বিশ্বামিত্র ও জনক ইঁহারা সকলেই যাগযজ্ঞ নিয়ত আনুষ্ঠানিক বৈদিক হিন্দু, ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিরোধ নাই এবং ইঁহারা পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। (২) রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র ছিনাইয়া লয়েন নাই, বশিষ্ঠের আদেশে দশরথ রামকে বিশ্বামিত্রের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। (৩) রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের দলে গিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই। (৪) বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কুল-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিতে আদেশ করেন নাই। (৫) অহল্যা অর্থ, পতিত ভূমি নহে, উহা বন্য উপবনে প্রতিষ্ঠিত যে কোন মূর্ত্তি। (৬) দাক্ষিণাত্য যাত্রিগণের সঙ্গে অহল্যার কোনও সম্পর্ক নাই। (৭) সমগ্র রামায়ণে রামচন্দ্রের কৃষিবিদ্যার কোনও ইঙ্গিত নাই।

আর একটা কথা এই যে, সমগ্র রামায়ণে দেখা যায় যে, রামচন্দ্র সর্ব্বদাই বশিষ্ঠের অনুগত, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যকে মান্য করার কথা কোথাও নাই।

রবীন্দ্রনাথ যদি এই স্থূল স্থূল প্রশ্নগুলির সমাধান করেন, তবে অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার চলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর পথ না দেখাইলে কবির বিদেশ-বাসের সময় আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কোচ-বোধ করিতাম।*

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

---

* এই প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধও অদ্য ৪ঠা শ্রাবণের ডাকে পাইয়াছি। শ্রীঃ

স্বপ্নতত্ত্ব। (৪)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা স্বপ্নঘটনার কতকগুলি কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে অতীন্দ্রিয়-দর্শন সম্বন্ধীয় একপ্রকার স্বপ্নের কথাও বলিয়াছি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রকারের স্বপ্ন জীবতত্ত্ব-হিসাবে বুঝিতে হইলে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, মানুষের সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার মানসবার্ত্তা প্রেরণার (১) শক্তি নিহিত আছে এবং তাহা অভিব্যক্তির ফলে পরিণত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই মনোজগতের অভিব্যক্তি জড়জগতের অভিব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের হইতে পারে।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, যে সমস্ত শারীর-তত্ত্ববিদেরা চেতনাশক্তিকে (২) মস্তিষ্ক-কোষের ক্রিয়ার ফলমাত্র মনে করেন, তাঁহাদেরও এই শ্রেণীর স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করিবার জন্য একপ্রকার সিদ্ধান্ত আছে। তাহাকে "মস্তিষ্ক-কোষের তরঙ্গ-নিক্ষেপ"(৩) বলা যাইতে পারে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রত্যেক চিন্তার ফলেই মস্তিষ্কের কোষে একপ্রকার ক্রিয়া হয়। এই তথ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। মস্তিষ্কের কোষে যে ক্রিয়া হয়, তাহা ব্যোম বা ইথরের ভিতর একপ্রকার আলোড়ন উপস্থিত করে, এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত। সেই আলোড়ন তরঙ্গাকারে ইথর সমুদ্রের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। তারপরে সেই সকল তরঙ্গ কোন প্রবল স্পন্দানুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্ককোষে আঘাত করিয়া ঐ তরঙ্গের কারণভূত চিন্তা-সমূহকে জাগাইয়া দেয়, এরূপ অনুমানও অযৌক্তিক নহে।

এই মতবাদ বাহির হইতে বেশ সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু মানসবার্ত্তা সম্বন্ধীয় স্বপ্নের (১) কতকগুলি অবস্থা ও লক্ষণ অনুধাবন করিলে এই মত ততটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে না। অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু, বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক মানসবার্ত্তা সম্বন্ধীয় স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই একটী আশ্চর্য্য-ব্যাপার দেখিতে পাইব যে, মানসবার্ত্তা সম্বন্ধীয় স্বপ্নগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রেরিত মানসবার্ত্তা। আসন্ন-মৃত্যু সময়ে নিশ্চয়ই ইহাদের জ্ঞানলোপ হইয়াছিল এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে 'মস্তিষ্ক-তরঙ্গ-বিক্ষেপ' মতানুসারে যে সময়ে মস্তিষ্ক খুব ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে এবং বোধ শক্তি মস্তিষ্ক-কোষের ক্রিয়া-বৃদ্ধির সহিত প্রখর হইয়া উঠে, সেই সময়েই উক্তরূপ মানস-বার্ত্তা প্রেরণ সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব-ব্যাপার এরূপ নহে। মুমূর্ষু-অবস্থায় মানসিক-বার্ত্তা প্রেরণা যে সম্ভব, ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, অন্য কোন শক্তি এই মানসবার্ত্তা-প্রেরণ-ক্ষমতার অন্তরালে কার্য্য করিতেছে।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী কিরূপভাবে মনের যন্ত্র (২) স্বরূপ হয় এবং তাহার কার্য্যই বা কি,

(১) Telepathy
(২) Consciousness
(৩) Brain-wave theory

(১) Telepathic Dreams
(২) Organ

তাহা এস্থলে বিবেচনা করা আবশ্যক। মস্তিষ্ক ব্যতীত অপর কোন বস্তুদ্বারা এক হইতে অন্য ব্যক্তিতে চিন্তাশক্তির সৃষ্টি বা প্রেরণা সম্ভব হইতে পারে, যদি আমরা এরূপ মনে করি, এবং সূক্ষ্মশরীরকে সেই বস্তু বিবেচনা করি, তাহা হইলে মস্তিষ্ক যে মনের যন্ত্র নহে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এই মত শারীর-তত্ত্বের বিরোধী হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ, শারীর-তত্ত্বানুসারে মস্তিষ্কের কোষই সমস্ত মানসিক-ব্যাপারের মূল বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই সমস্যাটী যে নিতান্ত সহজ নহে, ইহা যে গভীর অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে।

এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমেই মানসিক ক্রিয়াবলীর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মানসিক-ক্রিয়াবলী (যাহা সচরাচর আমাদের অনুভূতির গোচর হয়, তাহা) দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রত্যক্ষানুভূতি (২) ও পরোক্ষানুভূতি (৩)। কোন বাহ্যবস্তুর ধারণা (৪) করিবার সময়ে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয়, সেইগুলিকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীতও আর এক প্রকারের মানসিক ঘটনা বা ক্রিয়া আছে। বহির্জগতের কথা ভুলিয়া যখন আমরা নানারূপ জাগৎ-স্বপ্নে মগ্ন থাকি, সেই সময়ের মনের অবস্থা পরীক্ষা করা যাউক। মনের সেইরূপ শান্ত অবস্থায় মনকে উত্তেজিত করিবার বা মানসিক-গতির ব্যাঘাত জন্মাইবার কিছুই থাকে না। কিন্তু তবুও সেই সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বস্তু-সম্পর্কীয় শব্দস্পর্শাদি, বিবিধ স্থান, কাল ও জীবনের অবস্থা, নানারূপ ভাব ও চিন্তা, বহু অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা—এই সকলের বিচিত্র-দৃশ্যাবলী আমাদের মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত বিচিত্র-ছায়াদৃশ্য আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনে আবির্ভূত হয় ও আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়। আমাদের ইচ্ছার উপরে তাহারা নির্ভর করে না —তাহারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজগতি। কিন্তু যখন আমাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার প্রয়োজন হয় এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত মনের ক্রিয়া-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হয়, তখন আমরা স্মৃতিপথারূঢ় এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্যকে আমাদের আয়ত্বের মধ্যে আনিতে পারি। তখন আমরা প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি দৃশ্যকে মন হইতে অপসারিত করিয়া দিই, কতকগুলি বা মনে রাখিতে চেষ্টা করি; কতকগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিই, কতকগুলিকে আবার অবহেলা করিয়া ভুলিয়া যাই। এইরূপ স্থলে ঐ ছায়া-দৃশ্যগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন; সুতরাং ইহারা আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ও স্বভাবতঃ মনোমধ্যে আগত যে সমস্ত অনুভূতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারা এবং আমাদের আয়ত্বাধীন, ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে সমস্ত অনুভূতির কথা শেষে উল্লেখ করা গিয়াছে, এই উভয় প্রকার অনুভূতিকেই পরোক্ষানুভূতি বলা হয়। ইহা প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু পূর্ব্বলব্ধ প্রত্যক্ষানুভূতিরই ফল-স্বরূপ।

যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়ার সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হই-

(২) Presentative.
(৩) Representative.
(৪) Perception

য়াছে, সেইগুলি পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহারা প্রত্যক্ষানুভূতির অন্তর্গত। পরোক্ষানুভূতির সহিত মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ আছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, কোন পরোক্ষানুভূতি বিষয়ক ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে লইলে, শারীর-তত্ত্ববিদেরা বড় বিপদে পড়েন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দৃষ্টিশক্তির কথা ধরা যাউক। কি করিয়া পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপত্রের (১) উপর পতিত হয়, কি করিয়া তাহা দর্শনস্নায়ুর প্রান্তভাগে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং কি করিয়া সেই স্নায়বিক পরিবর্ত্তন মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহা শারীর-তত্ত্ববিদেরা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার একটী অতি গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা মস্তিষ্কে কোন পদার্থের যে প্রতিমূর্ত্তি অনুভব করি, তাহা ঐ পদার্থের প্রকৃত অবস্থানের বিপরীত, অর্থাৎ উল্টা। কিন্তু তবুও, বাস্তবিক পক্ষে, আমরা পদার্থ সমূহের প্রকৃত অবস্থানই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন যে, যদি আমরা সমস্ত পদার্থই উল্টা ভাবে দেখি, তবে পদার্থ সমূহের পরস্পরের তুলনায় তাহাদের অবস্থানের কোন পরিবর্ত্তনই অনুভূত হইবে না এবং আমরাও আমাদের ভুল বুঝিতে পারিব না। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কেন না, তাহা হইলে, দ্রষ্টার শারীরিক অবস্থানের তুলনায় অন্য সমস্ত পদার্থই উল্টা ভাবেই প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অনেক শারীরতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, প্রকৃত কথা এই যে, শরীরতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই। কি করিয়া পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপত্রের উপর পতিত হয়, সেই প্রতিমূর্ত্তি চক্ষুস্নায়ুর প্রান্তভাগে কিরূপে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং কিরূপে সেই স্নায়বিক পরিবর্ত্তন মস্তিষ্কে নীত হয়, কেবল এইটুকু শারীর-তত্ত্ববিদেরা বুঝাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে সেই স্নায়বিক পরিবর্ত্তন মস্তিষ্ক হইতে মনে দৃষ্টবস্তুর দর্শন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন নাই। খুব সম্ভব যে মস্তিষ্কে উপনীত ঐ বিপরীত প্রতিমূর্ত্তি যখন মনে যাইয়া দর্শন প্রত্যক্ষে পরিণত হয়, তখনই দৃষ্টি-শক্তির পূর্ব্বোক্ত ভ্রম সংশোধিত হইয়া থাকে —উল্টা প্রতিমূর্ত্তি তখনই সিধা হইয়া যায়। যে সমস্ত শারীরতত্ত্ববিদেরা এইকথা বলেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে মস্তিষ্ক যে মনের যন্ত্র নহে, ইহাই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে যদি আমরা মনোবিজ্ঞানের সহিত শারীর-তত্ত্বের মিল করিয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যে টুকু প্রকৃতপক্ষে প্রমাণিত হয়, তাহা এই—বহির্জ্জগতের অনুভূতি মস্তিষ্ক যন্ত্রের সাহায্যেই হয়। মৃত্যু যখন মস্তিষ্কের ধ্বংস সাধন করে, তখন এই জড়-জগৎ আমাদের জ্ঞানগোচর না হইতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের চেতনা-শক্তির যে ধ্বংস হইবে, এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কেননা, ইন্দ্রিয়ানুভূতিই ব্যক্তিত্ব ও চৈতন্যের প্রকৃত উপাদান নহে। পরোক্ষানুভূতি, স্মৃতি, ভাবসংযোগ, এই বৃত্তিগুলিই ইহার প্রকৃত উপাদান। খুব সম্ভব যে মস্তিষ্কের ন্যায় আর একটী যন্ত্র আছে। উহাই স্মৃতি প্রভৃতির প্রকৃত যন্ত্র। জড় জগতের অনুভূতির জন্য যেমন মস্তিষ্ক, এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলির অনুভূতির জন্যও তেমনই এই নূতন যন্ত্র। স্বপ্নচেতনা এই নূতন যন্ত্রেরই

(১) Retina.

ক্রিয়ার ফল—মস্তিষ্কের নহে। স্বপ্ন-চেতনার প্রবৃত্তি ও লক্ষণগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। স্বপ্ন-চেতনা কেবল কতকগুলি পরোক্ষানুভূতির সমষ্টি। এই পরোক্ষানুভূতি স্মৃতি ও ভাবসংযোগ হইতেই উৎপন্ন। আবার স্মৃতি ও সহকারী ভাবগুলি শেষোক্ত এই নূতন যন্ত্রের ভিতরই সঞ্চিত হইয়া থাকে। কোন কোন শারীরতত্ত্ববিৎ স্মৃতি ও ভাবসংযোগকে শারীরিক ক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেন যে তাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাহা না আলোচনা করিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সেইজন্য আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে সম্প্রতি চেষ্টা করিব।

স্মৃতিশক্তি, ভাবসংযোগ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির ব্যাখ্যাকল্পে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের দুই প্রকার মত আছে—(ক) বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব বা ভাবচিত্রের সম্ভাবনা দেহাপেক্ষী (১) অর্থাৎ তাহাদের সম্ভাবনা ও স্থায়িত্ব আমাদের শারীরিক যন্ত্রাদির উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; (খ) সেগুলি দেহ-নিরপেক্ষ (২) অর্থাৎ তাহাদের সম্ভাবনা ও স্থায়িত্ব আমাদের শারীরিক যন্ত্রাদির উপরে নির্ভর করে না।

উপরোল্লিখিত "দেহ-নিরপেক্ষ" মতের (৩) বিরুদ্ধবাদী অনেক শারীরতত্ত্ববিৎ স্বীকার করেন যে, তাঁহারা যে এই মতের বিরুদ্ধবাদী, তাহার কারণ ইহা নহে যে, এই মতের প্রতিকূলে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রবল যুক্তি আছে। তাঁহাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে এই মতটী আধুনিক যুগে "বৈজ্ঞানিক" বলিয়া বিবেচিত হইবে না বলিয়াই তাঁহারা এই মত গ্রহণ করেন না। 'বৈজ্ঞানিক' বলিতে তাঁহারা ইহাই বুঝেন যে, দেহপেক্ষী মত (৪) গ্রহণ করিলে স্মৃতি ও ভাবসংযোগ প্রভৃতি বিষয় আরও অনেক আবিষ্কার করিবার অবসর থাকে। কিন্তু দেহ-নিরপেক্ষ মতানুসারে ভবিষ্যতে নূতন তথ্যাবিষ্কারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। যাহা চেতনার অতীত, মনোবিজ্ঞানবিৎ তাহা মনোবিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের পরীক্ষার প্রণালী ও কার্য্যকৌশল কালক্রমে অধিকতর উন্নত হইতে পারে এবং তাহার ফলে মানসিক ক্রিয়াদির কারণ ও অবস্থাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু আপাততঃ বৈজ্ঞানিক কল্পনার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন বেশী কিছু আমাদের জানা নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দেহাপেক্ষীমতাবলম্বীরা স্মৃতি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য সম্প্রতি আমরা জেনারেল এসেম্‌ব্লী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রেভ, জার্ডিন (R. Jardine) প্রণীত একখানি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের চেতনা-গোচর হয়, তাহার প্রত্যেকটীই চেতনা-গোচর হয়—তাহার প্রত্যেকটীই চেতনা-গোচর হওয়ার পূর্ব্বে মস্তিষ্কের কোষে এক প্রকার ক্রিয়ার সঞ্চার করে। যদি আমরা কোন চেতনা-গোচর অনুভূতির প্রতি অবিরত মনোযোগ দিতে থাকি, তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মস্তিষ্ক-কোষের ক্রিয়াও পুনঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে

(১) Organic (২) Extra-organic (৩) Extra-organic theory (৪) Organic theory

এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ু-তন্তুতে ঐরূপ প্রকার স্থায়ী পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হইয়া যায়। (১) এই রূপে সর্ব্বদা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিজনিত যে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাই আমাদের দেহযন্ত্রে উত্তর কালের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং সহজে পুনরাবর্ত্তিত হইতে পারে। সেরিব্রাম্* যে সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্রের সমষ্টি, তাহাদের পরস্পরের ভিতর সংযোগ আছে। এই কারণে একটী স্নায়ুকেন্দ্রে কোন ক্রিয়ার সূচনা হইলে তাহা তৎসংযুক্ত অন্যান্য নানা স্নায়ুকেন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়া-সঞ্চারের ফলে অনুভূতির চেতনা-গোচর হওয়া না হওয়া অবশ্য বিবিধ জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে। এখন আমরা পূর্ব্বোক্ত কথাটীর সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই পাইলাম। শিরোবৃত্তের স্নায়ু-তন্তুতে নানা বিস্মৃত অনুভূতি স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। অতীত ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বা পরিবর্ত্তিত বিবিধ স্নায়ুকোষেও ঐ শিরোবৃত্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের জন্যই বিস্মৃতি অনুভূতি মনোমধ্যে পুনরাবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর হয়।" (১) এই গ্রন্থকারই আবার এই মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা আছে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"চেতনা-গোচর অনুভূতি ও স্নায়বিক ক্রিয়ার পরস্পরের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সেরিব্রামের স্নায়ু-তন্তুতে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও দেখিবার কোন উপায় নাই। দেখিবার উপায় থাকিলেও, সেই পরিবর্ত্তন (১) যে অনুভূতির ক্রিয়ার ফল, তাহাই বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? যে সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই মতটী দাঁড় করান হইয়াছে, সে গুলি অতি অপ্রচুর ও অস্পষ্ট। সে গুলি প্রায়ই নিম্নস্তরের প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ বা স্মৃতি ও কল্পনার বিশেষ অবস্থা হইতে সংগৃহীত। এই হেতু, এই

(১) In the hypothesis it is assumed that every sensation which has come into consciousness has been preceded and caused by some molecular movement in the substance of the brain, it is assumed that the repetition or continuance of a cerebral activity, occasioned by continued attention to the conscious feeling of which it is the antecedent, will have the effect of making a permanent change upon the nervous tissue, and thus of registering, as it were, the organic activity, so that it may be easily repeated It is assumed further that in the complex network of nervous centrs which constitutes the cerebrum, there is such a connection that any activity propagates itself from one centre to anotner and to many others and that this cerebral activity, may either excite conscious sensations or not according to circumstances Here then we have all the essential elements of the hypothesis There are, in the nervous tissue of the cerebrum, permanent registrations of forgotten feelings; permanent nerve cells or or clusters of cells produced or modified by some past activity, and these explain the permanent possibility of forgotten sensations being revived

*Cerebrum

(১) There is no possibility of observing directly the correspondence between conscious sensations and nervous activity, neither is there any possibility of observing any changes which may take place in the nervous tissue of the cererbum; and if there were, it could not be said

মতের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিকূল অবস্থা আছে এবং ইহার সঙ্গে অনেক জটিল সম্বন্ধ জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সে গুলির যে এ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না।"

এই দেহাপেক্ষী-মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত আরও দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এই মতের সমর্থন কল্পে অনেক অনুমানের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সে সমস্ত মস্তিষ্ক-কোষ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহারাও এই মতানুসারে মানসিক ভাব ও সংস্কার চিরকালের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পারে। এইরূপ মুদ্রিত হওয়ার বিরুদ্ধে শারীর-তত্ত্বানুসারেই মনের গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। উপরিলিখিত মত (দেহাপেক্ষীমত) প্রত্যক্ষানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্মৃতির সম্বন্ধে বেশ প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত স্মৃতি পরোক্ষানুভূতি সহিত জড়িত, এই মত দ্বারা তাহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

এইরূপে ভাবসংযোগের সম্বন্ধেও আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, মূল ভাব এবং তাহা হইতে ভাবসংযোগের ফলে যে সমস্ত ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই সমস্ত বিশেষ সম্বন্ধকে মনোবিজ্ঞানবিদেরা একটী সাধারণ নিয়মের মধ্যে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক বেইন তাহোদিগকে সাযুজ্য বিধি (১) ও সাদৃশ্য বিধি (২) এই দুইটী সাধারণ নিয়মে পরিণত করিয়াছেন। হ্যামিল্টন ও অন্যান্য দুই একজন পণ্ডিত এই দুই নিয়মকে সমকালিক বিধি (৩) ও সাধর্য্য বিধি (৪) নাম দিয়াছেন। কোন কোন মনোবিজ্ঞানিক আবার ঐ গুলিকে একটী মাত্র নিয়মের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই নিয়মকে সমষ্টি বিধি (৫) বলিয়াছেন। এই সমস্ত সাধারণ নিয়ম করিবার চেষ্টা দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে, ভাবসংযোগের নিয়মাবলী শারীর বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, স্মৃতি, ভাবসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে দেহাপেক্ষী মতের ভিত্তি অতি দুর্ব্বল ও অনিশ্চিত। অপর পক্ষে, এই সমস্ত মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা কল্পে দেহ-নিরপেক্ষ-মত নানারূপ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরসী লাল সরকার।

that tht is changes are the result of sentient activity. The evidence upon which the hypothesis is built is of a very indirect and obscure kind, cunsisting of fact observed by the vivisection of inferior animals, fact connected with peculiarities of memory and imagination Thus the hypothesis is connected with many difficulties and obscure problems which cannot as yet be said to be finally solved.

(1) Law of contiguity (2) Law of similarity, (3) Law of simultaniety, (4) Law of affinity, (5) Law of Redintegration or Integration

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র।

দ্বিতীয় পত্র।

ভক্তিভাজন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্-এ,

মহোদয় সমীপে।

আপনার রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আরও বহুবিধ অনুল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা, ইতিহাসের হিসাবে বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্জ্জন, এবং নানাবিধ বর্ণনা-বৈষম্য পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময়ে ও অবসাদে ব্যথিত হইতে হইয়াছে। সেই সকল বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। যে গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং যে গুলিতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে, আমার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের দিক দিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হইবে বলিয়া মনে করি, কেবল সেই গুলিরই আলোচনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিলে সুখী ও অনুগৃহীত হইব।

আপনার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নিজের নানাবিধ কর্ম্মসমষ্টি সম্বন্ধে তদানীন্তন জনমণ্ডলী-প্রদত্ত অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন শান্তভাবে সহ্য করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন "That a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice, perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation, my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly" এখানে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিমাণ ও সে সকলের ভাবী ফলাফলে দৃঢ়দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিলেন, এবং সে গুলি যে ভাগবতী কৃপাস্রোতপূত, ইহাও অনুভব করিতেন। কিন্তু আপনি তাঁহার বিষয় লিখিবার সময় ঠিক ইহার বিপরীত ভাব, ইচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করিয়াছেন (৭৫ও ৭৬ পৃষ্ঠা) "In fact the mission of Ram Mohon Roy was a simple one···the mission he unconsciously fulfiled and to which he was called, was to combine in the reawakened spiritual aspirations of the peple" এখানে দুটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাস্য আছে, রাজার mission কি simple oneই ছিল? আপনি তাঁহার কাজটাকে এত সহজ মনে করিলেন কেন? সে সময়ে এ দেশের ঘননিবিড় অরণ্যানীসদৃশ বিপত্তিপূর্ণ সামাজিক অন্ধকারে তিনি মানবজীবন ও মানবসমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনপ্রয়াসে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, আর আপনি সেটাকে একটা সহজ কাজ বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন? আর দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি তাঁহার মিশন ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে unconscious বালকভাবাপন্ন বা অবুঝের ভাবে পরিচালিত হইয়াই কার্য্য করিয়াছিলেন আপনি কি ইহাই মনে করেন?

অর্থাৎ তিনি যাহা যাহা করিতেছিলেন,সে সকল কাজে তাঁহার দিব্যানুভূতি ছিল না, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়? তাহা না হইলে "unconscious" অজ্ঞাত সারে কথাটা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের ধারণা কিন্তু ভিন্নরূপ, তিনি নিজের কাজের ফলাফল সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। আবার আপনি আপনার গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "With the farseeing eye of genius he beheld the dawning future of India and went forward with intrepid steps to open the door for the new light." আপনার যে মতে তিনি নিজ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে "unconscious" তিনিই কি আপনার উপরিউক্ত কয়েক পংক্তির লক্ষ্য হইতেছেন? মোট কথা এই যে, রাজার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও আপনি নানা স্থানে নানা প্রকার বিসংবাদ প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহার কার্য্য ও চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে পাঠকগণ আপনার বর্ণিত রাজাকে কি ভাবে দেখিবে, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

তাহার পর, যে মহাপুরুষের জীবনব্যাপী কার্য্য কলাপের মহৎ ফল, তপস্যার ধন, আজ পৃথিবীর সকল দেশীয় নরনারীমণ্ডলী ভোগ করিতেছেন, যে কাজের জন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহেন, কেবল ভারতবর্ষের নহেন, কিন্তু সমগ্র সভ্য জগতের অনন্যসাধারণ বরণীয় পুরুষ, আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি তাঁহার সেই মহদনুষ্ঠানের সম্বন্ধে একটী বাক্যও ব্যয় করেন নাই। কেন করেন নাই? জানেন না—সংবাদ রাখেন না বলিয়াই কি করেন নাই? সুতরাং এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, রাজার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কতটা অনভিজ্ঞ। রাজার সম্বন্ধে দুইদশটী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভিন্ন ভারতেই অল্প লোক বিষয়টীর সংবাদ রাখেন। কিন্তু আপনি যখন ইতিহাস লিখিতে বসিয়া রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমাদের ন্যায় মূর্খ ব্যক্তি রাজার সম্বন্ধে যে সংবাদ দীর্ঘকাল হইতে পরিজ্ঞাত, আপনার তাহা না জানার কারণ কি? লোকেই বা কি মনে করিবে? আমাদের চিরপূজ্য এবং চিরবরণীয় রাজর্ষি রামমোহন সভ্য জগৎকে"Comparative Theology" as a system of study উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয়টায় জাগতিক ধর্ম্মগুরু বা দর্শন শাস্ত্রবিদ্‌গণের কাহারও দৃষ্টি ছিল না, প্রয়োজন বোধও হয় নাই। তিনিই ইহার জন্মদাতা এবং অভিব্যক্তিকর্ত্তা। দুঃখের বিষয়, ধীরবুদ্ধি ও স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণ এ জন্য আপনার দৃষ্টি পরিচালনার প্রশংসা করিবে না। আপনারন্যায় শক্তিশালী পুরুষের লেখনীতে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক মহাত্মার চরিত্রচিত্র এরূপ অকারণে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

বহুবৎসর পূর্ব্বে আপনাকে আমি একদা আক্ষেপ ভরে বলিয়াছিলাম, আপনার স্মরণ আছে কিনা, জানি না, "এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইট কাঠ নির্ম্মিত উপাসনা মন্দিরকে ব্রাহ্মসমাজ ভাবিতেছেন কেন?"এ কথায় আপনি আমার উপর তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, আজ কিন্তু আপনার প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা পূর্ণ ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ইটকাঠের বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবন্ত মানবসমাজ ও সেই সমাজের কার্য্য কলাপের রীতি নীতির

সময়োপযোগী সুসঙ্গত পরিণতির বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য আলোচনা রামমোহন রায় সম্বন্ধে হয় নাই, আর কূপমণ্ডূকসদৃশ ব্রাহ্ম-পুঙ্গবগণের নিকট আমি বাজার সম্বন্ধে সে আশাও রাখি না, তবে আপনার নিকট সে আশা অবশ্যই করিতে পারি, কারণ আমি আপনাকে উত্তমরূপ জানি, জানি বলিয়াই বলি যে, কোন তীব্রদৃষ্টি-সম্পন্ন বুদ্ধিমান যুবক পরিচারকরূপে আপনার এ কার্য্যে সহায়তা করিলে নিশ্চয়ই ইহা ইহাপেক্ষা সুন্দরতর হইত।

আপনার স্মরণ থাকা উচিত, আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমণ্ডলী একদা উৎসবের সময়ে সকলে মিলিত হইয়া চুঁচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমাদের সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে গিয়াছিলাম। ঐসময়ে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহার রচনার ভার আপনার উপরে ন্যস্ত হয়। আপনি তাহা যথাযোগ্য রূপেই সম্পাদন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনান্তর মুদ্রণ করাইয়া সাধারণ-সমাজের সম্মুখস্থ ভবনে আমাকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। আমি একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নাই দেখিয়া আপনাকে বলিবামাত্র আপনি উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "এই জন্যই দশে মিলে কাজ করাই ভাল।" আপনার রচিত অভিনন্দন পত্র সবই সুন্দর হইয়াছিল, কেবল ছিল না যাহা, আমি আপনাকে বলিবা মাত্র আপনি তাহা উহাতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, "আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার সময় আমাদের সে সময়ের প্রধানগণ সামাজিক জীবনের এক পক্ষমাত্র, অর্থাৎ তখনও ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রাহ্ম পরিবার বলিয়া একটা বস্তু (Brahmo community) প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু আজ আমরা মহর্ষি সদনে দলে বলে পরিবার পরিজনে ও পুত্রকন্যাগণে সম্মিলিত হইয়া চলিয়াছি, অভিনন্দনে সেই দিনকার সেই অনুপম দৃশ্যে মহর্ষি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বলিবা মাত্র আপনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া কি আপনি অভিনন্দনে দৃষ্টিপাত করেন নাই? তাই বা কেমন করিয়া বলিব? অংশত তাহাও পুস্তকে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তখন দৃষ্টিপাত করিলেও আপনার মনে নাই যে, এখনকার ব্রাহ্ম-সমাজ একটা দলবদ্ধ পরিবার পরিজন-বিশিষ্ট লোকমণ্ডলীর সমাজ এবং সমাজ হিসাবে ইহার একটা সূচনার দিনও ধরিয়া লইতে হয়, এবং সেটা কোথায় কোন্ ব্রাহ্ম পরিবার অবলম্বন করিয়া সূচিত হইয়াছিল, এবং কেমন করিয়া ব্রাহ্ম-পরিবার গঠিত ও ক্রমে সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, সে বিষয়ে আপনার সুবৃহৎ গ্রন্থের কোথাও একটী কথাও নাই। কেন নাই? ঐদিক দিয়া ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই বলিয়া। ব্রাহ্মদল কেমন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে ও ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক জীবনে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তাহা যদি ইতিহাসের বিষয় না হয়, সেই সামাজিক জীবনের ফলাফল প্রদর্শন করা যদি আপনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব নাই করিলেন, তবে ইহাকে জগতের লোকের নিকট কি দিয়া আকর্ষণের বস্তু করিতে চান? কতকগুলি শুষ্ক ও নিরাকার মতের দ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট হইতে